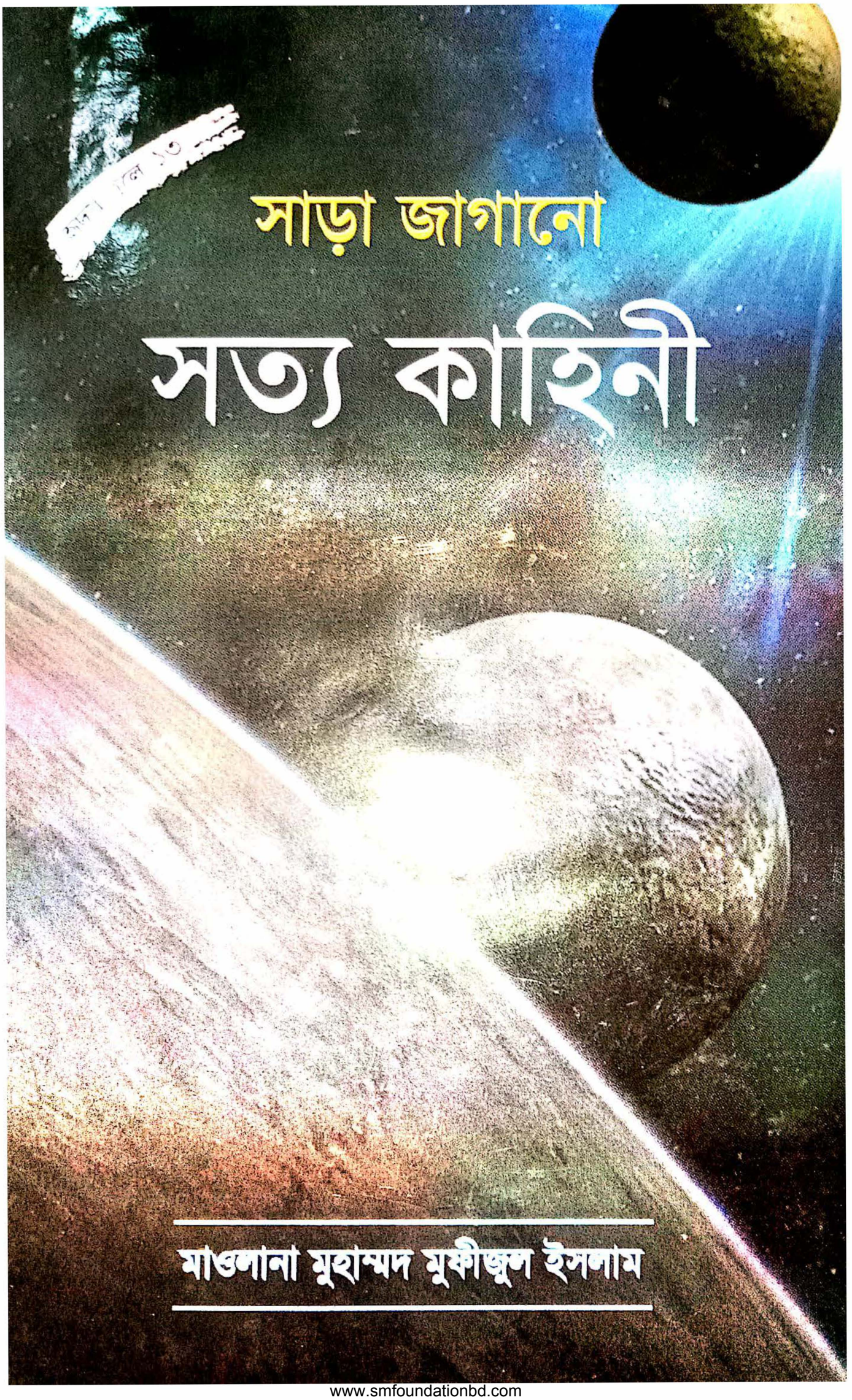

www.smfoundationbd.com

যে পাতায় যা আছে

হৃদয় গলে– ১৩

সাড়া জাগানো সত্য কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

এম. এ. [ফার্স্ট ক্লাস জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়]
দাওরায়ে হাদীস [ফার্স্ট ক্লাস, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড]
প্রাক্তন শিক্ষক, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর–১২ ঢাকা
শিক্ষা সচিব, নূরিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা, সাটিরপাড়া, নরসিংদী

সম্পাদনায়

মাওলানা আবুল কালাম মাসূম

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com

যে পাতায় যা আছে

সাড়া জাগানো সত্য কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
মোবা: ০১৭১২৭৯২১৯৩, ০১৯২৩২২৯০৯৬, ০১৮১১৮২৮০৩১

পরিবেশক
মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
মে ২০০৩

দ্বিতীয় প্রকাশ
জুলাই ২০০৩

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণে
ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
আবু দাউদ মুহাম্মদ জাকারিয়া

বর্ণ বিন্যাস
মাওলানা হুসাইন আহমাদ সাইফুল্লাহ
শিক্ষক, মাদরাসায়ে মাক্কিয়া মুহাম্মদিয়া
৯/১, আরএনডি রোড, লালবাগ, ঢাকা

মূল্য
একশত বিশ টাকা মাত্র

www.smfoundationbd.com

যে পাতায় যা আছে

অর্পণ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুর জনাব
মুহাম্মদ জাকির হুসাইন ইউনুস
—এর দস্ত মোবারকে।

—লেখক।

www.smfoundationbd.com

পরিপূর্ণ ফলাফল প্রাপ্তির জন্য নিম্নবর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী

এ সিরিজ পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন

☞ প্রথমে উদ্দেশ্য ঠিক করে নিন। অর্থাৎ এ নিয়ত করুন যে, আমি সিরিজের প্রতিটি বই আল্লাহ তাআলাকে রাযী খুশি করার জন্যে আমলের নিয়তে পাঠ করব।

☞ সিরিজের যে কোন বই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ধারাবাহিকভাবে ধীরে ধীরে মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। যদিও তাতে কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়।

☞ সিরিজের যে কোন বই পড়ার উদ্দেশ্যে হাতে নেয়ার সময় অনুগ্রহ পূর্বক একটি কলম ও ছোট্ট একখানা খাতা কাছে রাখুন। তারপর "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" বলে পড়তে শুরু করুন। একটি ঘটনা পড়া শেষ হয়ে গেলে উক্ত ঘটনার মাধ্যমে লেখক আপনার নিকট যা আশা করছেন (অর্থাৎ কোন ভাল গুণ অর্জন বা মন্দ গুণ বর্জন) তা যদি আপনার মধ্যে আগেই থেকে থাকে তবে আলহামদুল্লিাহ বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে পরবর্তী ঘটনা পাঠ শুরু করে দিন। অন্যথায় উক্ত গুণটি এই নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে খাতায় উঠিয়ে নিন যে, ইনশাআল্লাহ এই গুণটি অবশ্যই আমি অর্জন করব। সম্ভব হলে সাথে সাথে আমল শুরু করে দিন। আর যদি বিষয়টি এমন হয়, যা এখনই আমল করা সম্ভব নয়, (যেমন স্বামীর খেদমত কিংবা স্ত্রীর হক আদায় অথচ আপনার এখনো বিয়েই হয়নি) তবে সময় মতো তা আমল করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হউন।

☞ প্রতিটি ঘটনা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে উপরে বর্ণিত নিয়মগুলো আন্তরিকভাবে পালন করতে সচেষ্ট হলে, আমি জোর দিয়েই বলতে পারি, আল্লাহ চাহে তো, সফলতা আপনার পদচুম্বন করবে। দুনিয়া ও আখিরাতে আপনি কামিয়াব হবেন। উপরন্তু আপনার হৃদয় জগতে সর্বদা বইতে থাকবে শান্তির সুবাতাস। যারা নিয়ম অনুসরণ না করে সিরিজের এক বা একাধিক বই পড়ে নিয়েছেন, তাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ হলো, আপনারা কষ্ট করে বইগুলো নিয়মানুযায়ী আবার পড়ে নিন। এতে কেবল আপনারই নয়, গোটা জাতির উপকার হবে, ইনশাআল্লাহ।-লেখক

☞ বিঃ দ্রঃ সিরিজের বইগুলো পাঠ করে যদি ভাল লাগে এবং আপনি মনে করেন যে, এসব বই অন্যদেরও পাঠ করা প্রয়োজন, তবে দ্বীন প্রচারের একটি অংশ হিসেবে মা-বাবা ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র-ছাত্রী ও পাড়া প্রতিবেশীদেরকে তা পড়তে উৎসাহিত করুন। সম্ভব হলে হাদিয়া দিন। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আকাবিরে উম্মতের দীপ্ত প্রদীপ
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ উস্তাদুল আসাতিজা
শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (দাঃ বাঃ) এর মূল্যবান

অভিমত ও দু'আ

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর।

আল্লাহ ওয়ালাদের সোহ্বত ও সংস্পর্শ মানুষের আত্মার সংশোধন ও নফসের ইসলাহের উত্তম উপায়। অনুরূপভাবে বুজুর্গানে দ্বীন ও মনীষীদের জীবনী, জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী এবং চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন গল্প-কাহিনী পাঠের মাধ্যমেও মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়। এই জন্যই বলা হয়, "পূর্বেকার লোকদের ঘটনাবলীতে রয়েছে পরবর্তীদের জন্য উপদেশাবলী।"

হৃদয়বিদারক ও চরিত্রগঠনমূলক বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য সত্য ঘটনার সমন্বয়ে স্নেহভাজন তরুণ লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম "যে গল্পে হৃদয় গলে" (চলমান অংশের নাম সাড়া জাগানো সত্য কাহিনী) নামক বইখানা রচনা করেছেন। সেই সাথে ঘটনার শিক্ষণীয় দিকগুলো প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এতে লেখক সফল হয়েছেন বলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপরন্তু হৃদয়ের গভীরে এতটা জোড়ালোভাবে রেখাপাত করার মত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষার চরিত্রগঠনমূলক এমন সুন্দর গল্পগ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুব কমই দেখা যায়। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রাণ খুলে দোয়া করি, হে আল্লাহ! তুমি লেখককে ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান ক্ষুরধার কলম সৈনিক হিসাবে কবুল কর এবং তার খেদমতকে উম্মতের জন্য হিদায়াতের উসিলা বানাও। আমীন।

৩০ সেপ্টেম্বর ০৩ইং

(শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক)

ফকীহুল উম্মাহ মুফতী মাহমুদুল হাসান গংগুহী (রাহঃ) -এর সুযোগ্য
খলীফা জামিয়াতু ইবরাহীম (আ.) মাদরাসার
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল শাইখুল হাদীস আলহাজ্ব
হযরত মাওলানা মুফতী শফীকুল ইসলাম সাহেবের মূল্যবান

বাণী ও দু'আ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনের জন্য ইসলামের কোন বিকল্প নেই। একজন মানুষ তখনই সুখ-সমৃদ্ধি ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে যখন সে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সঠিকভাবে জেনে তদানুযায়ী আমল করে। আর ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো নির্ভরযোগ্য, সৎ ও খোদাভীরু লেখকদের বই-পুস্তক ও কিতাবাদী পাঠ করা।

মানুষের একটি স্বভাবজাত ধর্ম হল, তারা একদিকে যেমন হৃদয়বিদারক গল্প-কাহিনী শুনতে ও পড়তে ভালবাসে ঠিক তেমনি বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে কোন কঠিন বিষয় অনুধাবন করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সহজ হয়। স্নেহাস্পদ মাওলানা মুফীজুল ইসলাম তার "যে গল্পে হৃদয় গলে" (চলমান অংশের নাম সাড়া জাগানো সত্য কাহিনী) নামক গ্রন্থের মাধ্যমে মূলতঃ এ কাজটিই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন আদর্শ মানবের প্রধান প্রধান করণীয়-বর্জনীয় কাজগুলোকে বিভিন্ন সত্য ঘটনা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তা হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, শিক্ষাবিহীন অবাস্তব গল্প-কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রগঠনমূলক এ গল্প-কাহিনীগুলো সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের গল্প পাঠের আনন্দদানের পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে এবং সেই সাথে তদানুযায়ী জীবন গঠন করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিতও করবে।

দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন বইটিকে উম্মতের হিদায়েতের জন্য কবুল করেন এবং ভবিষ্যতে লিখককে এ জাতীয় আরও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার তাওফীক নসীব করেন। আমীন।

১৫ সেপ্টেম্বর ০৩ইং

(মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম)

যে পাতায় যা আছে

প্রথম অধ্যায়

১। সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় ৯
২। সঠিক সিদ্ধান্ত ১৪
৩। কিশোর শ্রমিকের দ্বীনদারী ১৯
৪। বিশ্বস্ত রাখাল ৩২
৫। আপন পর সবই সমান ৩৫
৬। তিন বন্ধুর অমর কাহিনী ৩৯
৭। সত্য কথাই বলে যাব ৪৪
৮। মায়ের অবাধ্য হয়ে হজে যাওয়ার পরিণতি ৫৩
৯। বিশ্বস্ত ক্রীতদাস ৬০
১০। চরম শাস্তি ৬৭
১১। কে অধিক দানশীল? ৭৫
১২। অবৈধ প্রেম ঃ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ৭৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন? ৮৩ -১০২
১। অপূর্ব বিনয় ৮৩
২। শায়খুল হিন্দ কি জিনিস ৮৫
৩। কিতাবের আদব ৮৬
৪। পড়াশুনায় একাগ্রতা ৮৭
৫। নম্রতা ও অঙ্গীকার পালনের বিরল দৃষ্টান্ত ৮৮
৬। সমসাময়িকদের প্রতি শ্রদ্ধা ৯০
৭। মুজাহিদ বেশে মাওলানা নানুতবী (র.) ৯১
৮। ঔষধের স্থলে বিষ ৯২
৯। খেদমতের অনন্য দৃষ্টান্ত ৯৩
১০। একেই বলে পরহেজগারী ৯৪
১১। আমল পরিবর্তনের অনুপম পদ্ধতি ৯৫
১২। হালাল খাদ্যের প্রভাব ৯৬
১৩। বেতন গ্রহণে আপত্তি ৯৭
১৪। বেতন বাড়াতেও অনীহা ৯৮
১৫। তাকওয়ার অনন্য দৃষ্টান্ত ৯৯
১৬। মাথায় যখন আমের বোঝা ১০০
১৭। শায়খের প্রতি বিরল সম্মান ১০১
১৮। শায়খের প্রতি মনোযোগ ১০২

পরিশিষ্ট

পাঠকের মতামত ১০৩

প্রথম অধ্যায়

সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়

বলিষ্ঠ এক যুবক। আরবের মরু এলাকায় তার বাস। মদীনা থেকে দূরে বহু দূরে অবস্থান করে সে। বিশেষ প্রয়োজনেই কেবল মদীনায় যায়। কয়েকদিন থাকে। আবার ফিরে আসে।

তখন চলছিল সিংহ পুরুষ হযরত ওমর (রা.)এর শাসনকাল। একদিন যুবকের মদীনায় যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। বিশেষ প্রয়োজন। যেতেই হবে। না যেয়ে উপায় নেই।

দিনক্ষণ ঠিক করে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল যুবক। যেতে হবে তাকে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে অনেক দূরে। সুদূর মদীনায়। সফর সঙ্গী হিসেবে একটি উট ছাড়া অন্য কেউ নেই। হাতে সময় ছিল খুবই কম। সেজন্য জরুরি বিশ্রাম ব্যতীত বাকি সময়টুকুতে বিরামহীন ভাবে চলছিল সে।

চলার পথে ক্লান্ত দেহটাকে খানিক চাঙ্গা করে নেওয়ার জন্য এক সময় বিশ্রাম নিচ্ছিল যুবক। ভীষণ পিপাসা ও ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্যে সঙ্গে নিয়ে আসা সামান্য খাদ্য ও পানি বিশ্রামের শুরুতেই গলার নিচে পাঠিয়ে দিয়েছে সে। এবার উটটাকে খেজুর বাগানে ছেড়ে দিয়ে একটি গাছের ছায়ায় মনের সুখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আরব দেশে প্রচুর খেজুর বাগান রয়েছে। ছোট বড় মাঝারি সব ধরনের বাগানই আছে সেখানে। যে বাগানটিতে যুবক বিশ্রাম নিচ্ছিল সেটি খুব বেশি একটা বড় ছিল না। একজন মালি বাগানটি দেখাশুনা করত। পানি দিত। আগাছা পরিস্কার করত। ভাল ফলনের জন্য যা কিছু করা দরকার সবই করত সে।

সেদিন মালি বাগানে কাজ করছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল, একটি উট এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। উটের পায়ে পিষ্ঠ হয়ে কিছু চারা গাছ ইতোমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে মালি রেগে যায়। সঙ্গে সঙ্গে উটটিকে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে উহার প্রতি একটি পাথর নিক্ষেপ করে। উটটিকে মেরে ফেলার কোন ইচ্ছা মালির ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার নিক্ষেপিত পাথরটি উটটির ঠিক বুক বরাবর প্রচন্ড বেগে আঘাত হানে। এতে ছটফট করতে করতে তৎক্ষণাৎ উটটি মারা যায়।

মালি ভয়ে কাঁপতে থাকে। এক অজানা আশংকায় তার বুক দুরু দুরু করে। চেহারায় ফুটে উঠে উৎকণ্ঠার ভাব। একটু দূরে হঠাৎ এক যুবককে দেখতে পেয়ে ভাবে, উটের মালিক হয়তো সেই হবে। মালি দেরি করে না। সে ছুটে যায় বেদুঈন যুবকের নিকট। খুলে বলে সবকিছু। তারপর বিনীত কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করে যুবকের নিকট।

যুবক উটটিকে সীমাহীন ভালবাসত। সেটি ছিল তার সবচাইতে প্রিয় উট। তদুপরি এ মুহূর্তে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে এটি। তাই উটের মৃত্যুর কথা শুনে যুবক দিশেহারা হয়ে পড়ল। হারিয়ে ফেলল হিতাহিত জ্ঞান। ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে মালির দাড়ি ধরে সজোরে ঝাকুনি দিতে লাগল। এ সময় মালি ছিল বেশ অসুস্থ। তাই যুবকের ঝাকুনি সহ্য করতে না পেরে সেও এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

এবার যুবক কিংকর্তব্যবিমুঢ়। কি করল, কি করা তার উচিত কিছুই বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে এলে সেও কেঁদে ফেলল। অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল, একি করলাম আমি! অন্যায়ভাবে আমি একজন মানুষকে হত্যা করলাম!

এতক্ষণে মালির ছেলেরা বাগানে এসে উপস্থিত। তারা যুবকের মুখ থেকে সবকিছু শুনল। তারপর বিচারের জন্য তাকে নিয়ে গেল খলীফার দরবারে। খলীফা উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করলেন। যুবক তার বক্তব্য প্রদানে বিন্দুমাত্রও মিথ্যার আশ্রয় নিল না। সে অকপটে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করল।

বাদী বিবাদীর কথা শুনে খলীফা কিছুক্ষণ ভেবে নিলেন। যুবকের

সত্যবাদিতায় তিনি মুগ্ধ হলেন। কিন্তু হত্যার পরিবর্তে হত্যা–ইসলামের এই বিধানের কারণে যুবককে কতল করার নির্দেশ দিলেন।

যুবক বলল, খলীফার নির্দেশ শিরোধার্য। তার ফায়সালা অবশ্যই কার্যকর হবে। তবে আমার একটি আবেদন ছিল।

ঃ বল তোমার কী আবেদন? খলীফা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন।

ঃ আমীরুল মুমেনীন! হুকুম তামীলের পূর্বে পরিবার পরিজনকে একনজর দেখতে চাই। চির বিদায় আনতে চাই তাদের কাছ থেকে। এটিই আমার জীবনের শেষ ইচ্ছা।

ঃ তোমার এ আবেদন পূর্ণ হতে পারে। তবে এজন্য প্রয়োজন একজন জামিনদারের। তুমি না এলে তোমার পরিবর্তে তাকেই কতল করা হবে।

খলীফার দরবার লোকে লোকারণ্য। চতুর্দিকে কেবল মানুষ আর মানুষ। যুবককে চিনে এমন কেউ এখানে নেই। উপস্থিত সকলের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় যুবক। তার দৃষ্টি যেন এ কথাই বলছিল- হে উপস্থিত জনতা! তোমরা যে কেউ আমার জামিন হতে পার। যে কোন মূল্যের বিনিময়ে নির্ধারিত সময়ে এখানে আমি উপস্থিত হবোই।

নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ। কেউ কোন কথা বলছে না। একে অপরের দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে তারা। সময় বয়ে চলছে তার আপন গতিতে।

উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন ছিলেন আবু যর গিফারী (রা.)। তিনি এতক্ষণ সকলের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন। যুবকের সত্যবাদিতায় ইতোমধ্যেই তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এবার জামিনের প্রশ্ন আসায় তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, আমি এ যুবকের জামিন হব। তাকে জীবনের শেষ আকাঙ্খা পূর্ণ করার সুযোগ দেওয়া হোক।

জামিন পেয়ে যাওয়ায় খলীফা যুবককে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিলেন। যুবক বিলম্ব করল না। ছুটে চলল স্বজনদের পানে। কয়েকদিন পূর্বে এক সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করেছিল সে। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন বিশেষ করে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী কিভাবে তাকে চির বিদায় জানাবে, কি হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হবে-চলার পথে এ চিন্তাটিই বারবার ঘোরপাক খাচ্ছিল তার মাথায়।

যুবক কখনো মিথ্যা বলে নি। প্রতারণা করে নি। আজীবন সে গেয়েছে সত্যের জয়গান। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সে গোটা জীবন সংগ্রাম করেছে। সততা, সত্যবাদিতা ও ওয়াদা পালনে সে ছিল সর্বদা সচেষ্ট।

পথ চলতে গিয়ে যুবক ভাবে, আজ যদি আমি সততার পরিচয় না দিয়ে ওয়াদা ভঙ্গ করে পুনরায় ফিরে না যাই তবে আমি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাব। রক্ষা পাব আক্রমণ থেকে। সুখে শান্তিতে আরো কিছুদিন বসবাস করতে পারব একান্ত আপনজনদের সাথে। কিন্তু না, জীবনের চেয়ে ওয়াদার মূল্য, জীবনের চেয়ে সততার মূল্য অনেক, অনেকগুণ বেশি। সুতরাং জীবনের মায়ায় প্রিয়জনদের কান্না ভেজা চেহারা পানে তাকিয়ে কখনো মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। ভঙ্গ করা যাবে না প্রতিশ্রুতি, গুড়িয়ে দেওয়া যাবে না সততার সুরম্য প্রাসাদ।

যুবক বাড়ির দিকে যতই এগিয়ে চলছে ততই মনকে শক্ত করে নিচ্ছে। এভাবে চলতে চলতে এক সময় সে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। ভনিতা না করে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে সবার নিকট বলে ফেলে খলীফার ফয়সালার কথা। সেই সাথে এও বলে যে, বিলম্ব করা যাবে না, আমাকে এখনই যেতে হবে।

যুবকের কথায় পিতা-মাতা, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের চোখেই পানি দেখা দেয়। বারবার হুঁশ হারায় নব বিবাহিতা যুবতী স্ত্রীও। সে এক করুণ ও মর্মান্তিক দৃশ্য!

খলীফার নিকট ফিরে যেতে অনেকে যুবককে বাধা দেয়। যুক্তির মারপ্যাচে বিভিন্ন উপায়ে বুঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু যুবক নাছোড় বান্দা। সে তার ওয়াদা পালনে এক পায়ে খাড়া। জীবন রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে কিছুতেই সে রাজি নয়। সুতরাং সবাইকে শেষ বারের মত বিদায় জানিয়ে দ্রুত ঘোড়া হাকিয়ে খলীফার নিকট উপস্থিত হল সে।

খলীফা বললেন, হে যুবক! তোমার প্রতিশ্রুতি পূরণ, তোমার কর্তব্য নিষ্ঠা ও সততায় আমি যারপর নাই খুশি হয়েছি, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তোমাকে সহযোগিতা করার কোন উপায় আমার নেই। একথা বলে মালীর ছেলেদের দিকে তাকালেন তিনি। অতঃপর জানতে চাইলেন তাদের মতামত।

এ মুহূর্তে মালীর ছেলেরা যেমন যুবকের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে, ঠিক তেমনি ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে তাকে রক্ষাও করতে পারে। মজলিসে পিন পতন নীরবতা। সবাই এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে ছেলেদের মুখের দিকে। তারা কি বলে, সে কথা শুনার জন্য সকলেই এখন উন্মুখ হয়ে আছে। যুবক একপাশে দাঁড়িয়ে আছে মাথানত করে।

যুবকের সততায় কেবল খলীফা ও উপস্থিত জনতাই নয়, মালীর ছেলেরাও অত্যধিক মুগ্ধ হয়েছিল। তাই খলীফার প্রশ্নের জবাবে এক বাক্যে তারা বলে উঠল, আমরা যুবককে ক্ষমা করে দিলাম। তাদের এ উদারতায় মহানুভব খলীফা খুশি হয়ে বললেন, আমি দেশ জয়ে যে আনন্দ পাইনি, সে আনন্দ আজ তোমাদের মধ্যে পেলাম।

অতঃপর খলীফা হযরত আবু যর গিফারী (রা.)কে কাছে ডাকলেন। বললেন, হে রাসূলের প্রিয় সাহাবী! আপনি কেন এ অপরিচিত যুবকের জামিন হতে গেলেন? যদি সে না ফিরত তবে আপনার অবস্থা কি হত তা একটু ভেবে দেখেছেন কি?

উত্তরে তিনি বললেন, হে মান্যবর খলীফাতুল মুসলিমীন! যুবকের সত্যবাদিতার প্রতি আমার আস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলেই আমি এতবড় ঝুঁকি নিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। মালী হত্যার ঘটনাকে সে যেভাবে অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে, তাতেই আমার মনে হয়েছে যে, সে এক সত্যবাদী যুবক। জীবন বাঁচানোর জন্য কখনোই সে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিবে না। এক কথায়, সততা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়েই আমি তার জামিন হয়েছি।

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ! মিথ্যা নয়, সত্যই যে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে, টেনে তুলতে পারে ধ্বংসের অতল গহ্বর থেকে-বর্ণিত ঘটনাটি তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই আসুন, সদা সত্য কথা বলি মিথ্যা পরিহার করে চলি। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও সত্য কথা বলে যাব। আমৃত্যু বেঁচে থাকব, মিথ্যা ও ধোকা নামক ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে। হে দয়ার আধার! তুমি আমাদের শুধু প্রতিজ্ঞাই নয়, তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দেওয়ারও তাওফীক দাও। আমীন।

[সূত্র ঃ দিলকাশ ওয়াকিয়াত]

সঠিক সিদ্ধান্ত

পাহাড়ী এলাকা। উঁচু নীচু টিলার পাশ কেটে বয়ে চলেছে একটি ছোট্ট নদী। কতগুলো স্বচ্ছ ঝরণাধারা টিলার পাশ কেটে নেমে এসে মিশে গেছে নদী বক্ষে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে এসব অঞ্চল অপূর্ব রূপ ধারণ করে। স্বচ্ছ জলরাশির বুকে ভোরের আলোক রশ্মি সৃষ্টি করে এক মহাসমারোহ। তেমনি বেলা শেষের সূর্যের আলো সোনালী বন্যায় ছেয়ে দেয় সবকিছু। ঠিক সুন্দর একটি ছবির মতই দেখতে এলাকাটি।

নদীর অনতিদূরে একটি সুন্দর গ্রাম। গ্রামের এক পাশে বিশাল জঙ্গল। কিছু কিছু হিংস্র জানোয়ারও বাস করে এ জঙ্গলে। গ্রামের অবস্থান পাহাড়ী অঞ্চলে হলেও শহরের অনেক সুযোগ সুবিধা এখানে রয়েছে। ছোট-খাট প্রয়োজনের জন্য এখন আর শহরে যেতে হয় না।

গ্রামের অধিকাংশ লোক কৃষক। ক্ষেতে খামারে কাজ করে। উঁচু ভূমি কেটে সমতল করে তাতে ফসল ফলায়। হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর যা পায় তাতে কোন রকম সংসার চলে যায়।

উক্ত গ্রামে বাস করতেন আব্দুল আজীজ নামের একজন ধার্মিক লোক। কৃষি কাজ তার পেশা হলেও ধর্মীয় বিধি-বিধান তিনি ঠিকমত মেনে চলতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করতেন। সুন্নত মোতাবেক জীবন চালাতেন। গরিব-দুঃখীরা হাত পাতলে কখনোই তাদেরকে বিমুখ করতেন না। সামর্থ অনুসারে যা পারতেন, দিয়ে বিদায় করতেন।

একদিনের ঘটনা। সেদিন ছিল শুক্রবার। জুমআর দিন। খানিক পূর্বে

জুমআর আযান হয়ে গেছে। নামাজের জন্য বেশ আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে বসে ছিলেন আব্দুল আজীজ। আযান শুনার পর ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদের দিকে পা বাড়ালেন। ঠিক এমন সময় প্রায় এক সাথে তিনটি সমস্যা দেখা দিল। আর সমস্যাগুলেওা এমন যার সমাধান এখনই হওয়া প্রয়োজন। তিনি মসজিদ পানে অগ্রসর হলে স্ত্রী ডেকে বললেন, ওগো! কোথায় যাচ্ছেন? মিল থেকে আটার বস্তা আনার কথা স্মরণ আছে তো?

স্ত্রীর কথায় আব্দুল আজীজ থমকে দাঁড়ালেন। মনে মনে চিন্তা করলেন- হ্যাঁ, ঠিকই তো, সকালে মিলে গিয়ে ভাঙ্গানোর জন্য গম দিয়ে এসেছি। এখনো তা আনা হয়নি। বেলা একটার দিকে মিল বন্ধ হয়ে যাবে। রবিবার নয়টার আগে খুলবে না। কারণ শনিবার সাপ্তাহিক বন্ধের দিন। ঘরেও অন্য কোন খাবার নেই যা দিয়ে ৫/৭ বেলা খাবার চালানো যাবে। তাহলে এখন উপায়?

আব্দুল আজীজ ভীষণ ভাবনায় পড়লেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, বাড়ি থেকে মিল অনেক দূরে। যদি এখন আটার বস্তা আনতে যাই তবে জুমআর নামাজ নিশ্চিত ফওত হয়ে যাবে। আরো সমস্যা হল, ঐ দিকে কোন মসজিদও নেই যে, নামাজটা সেখানে আদায় করে নেওয়া যাবে। আর যদি নামাজ পড়তে যাই তবে পরিবারের সবাইকে প্রায় দু'দিন না খেয়ে উপোস থাকতে হবে।

হঠাৎ কারো আওয়াজে আব্দুল আজীজের চিন্তাজালে বাধা পড়ে। ফিরে তাকান তিনি। দেখলেন, পাশের বাড়ির একটি ছোট্ট ছেলে দৌড়ে এসে বলছে-চাচাজান! আপনার ঘোড়াটি আস্তাবল থেকে ছুটে পালিয়েছে। ওকে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখেছি। যদি এখনই খুঁজে না আনেন, তবে উহা গভীর জঙ্গলে হারিয়ে যাবে কিংবা হিংস্র জানোয়ার খেয়ে ফেলবে।

আব্দুল আজীজ আরো চিন্তিত হলেন। তার সুন্দর ললাটে ফুটে উঠল গভীর চিন্তা রেখা। সাওয়ারীর উপযোগী একমাত্র ঘোড়াটি যদি হারিয়ে যায় তাহলে উপায় কি হবে? সুতরাং এখন কি তিনি নামাজে যাবেন, না বস্তা এনে ঘোড়ার খুঁজে বেরিয়ে পড়বেন- এই হল সিদ্ধান্তের ব্যাপার।

আব্দুল আজীজ এখনো সিদ্ধান্ত নিয়ে সারতে পারেন নি। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ভাইজান! আপনার পাশের জমিতে মেশিন দিয়ে সেচ দেওয়া হচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে সেচের কাজ শেষ হয়ে যাবে। শুনলাম, কাজ

শেষ হওয়ার সাথে সাথে মালিক তার মেশিন নিয়ে চলে যাবে। আপনার জমিনটাকে শুকনো দেখে এলাম। পানি দেওয়ার খুবই প্রয়োজন বলে মনে হল। আমি এখন অনেক দূর যাওয়ার জন্য রওয়ানা দিয়েছি। তাই ভাবলাম, যাওয়ার পথে আপনাকে খবরটা দিয়ে যাব। যদি জমিতে পানি দিতে চান তবে ১০/১৫ মিনিটের মধ্যেই মালিককে জানাতে হবে।

আব্দুল আজীজ এবার চিন্তার অথৈই সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। পরপর তিনটি জরুরি কাজ তার সামনে হাজির হয়েছে। এই মুহূর্তেই কাজগুলো সমাধা করা দরকার।

আব্দুল আজীজ চিন্তা করলেন, নামাজ আল্লাহর হুকুম। তদুপরি তা আবার জুমুআর নামাজ। যা জামাত ব্যতীত আদায় হয় না। আল্লাহ পাকের হুকুম ঠিকমত পালন করলে তিনি যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দিবেন, এটা তারই ওয়াদা। অতএব ভয় কিসের? আমি সর্বাগ্রে তার হুকুম পালন করব। এরপর যা হবার তাই হবে। তবে আমার বিশ্বাস, তিনি আমার যাবতীয় সমস্যার উত্তম সমাধান করে দিবেন। এ বলে তিনি নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে চলে গেলেন।

গুরুত্বসহকারে এহতেমামের সাথে নামাজ আদায় করা ছিল আব্দুল আজীজের চিরাচরিত অভ্যাস। তাই আজও তিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করলেন না। সুন্দর ভাবে ধীরে সুস্থে নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরলেন।

বাড়ি ফিরে আব্দুল আজীজের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটা অভূতপূর্ব আনন্দে নেচে উঠল তার হৃদয় মন। তিনি দেখলেন, আস্তাবলে ঘোড়া বাধা আছে। বিবি আটা দিয়ে রুটি তৈরি করছে। বাচ্চারা ডাল মিশিয়ে বড় মজা করে রুটি খাচ্ছে।

দুটি সমস্যার সমাধান হতে দেখে আব্দুল আজীজ দ্রুত হেঁটে জমিনে গেলেন। দেখলেন, জমিনও পানিতে টইটম্বুর। যে পরিমান পানির প্রয়োজন ছিল, ঠিক সে পরিমানই দেওয়া আছে। কিন্তু জমিনে কিভাবে পানি এল তা জিজ্ঞেস করার মত কোন লোক সেখানে পাওয়া গেল না।

আব্দুল আজীজ ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে এলেন। রান্না ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে বললেন-

ঃ রাবেয়া! আটা পেলে কোথায়?

ঃ পেটে নিশ্চয় ক্ষুধা আছে। আগে খেতে বসুন তারপর সবই বলছি।

আব্দুল আজিজ স্ত্রীকে খুবই ভালবাসেন। তাই কথা না বাড়িয়ে একটা চাটাই বিছিয়ে সুবোধ বালকের মত রান্নাঘরেই খেতে বসলেন। তার কৌতুহলী মন ঘটনার রহস্য উদঘাটনের জন্য কেবলি উন্মুখ হয়ে উঠছিল। সময় যতই যাচ্ছিল তার আগ্রহের মাত্রা ততই তীব্রতর হচ্ছিল।

স্ত্রী রাবেয়া স্বামীর মনোভাব বুঝতে পারল। সে একটু কেশে গলাটা পরিস্কার করে নিয়ে বলতে লাগল-

ঃ অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলো কিভাবে সমাধা হলো তা জানার জন্য মনটা ছটফট করছে, তাই না?

ঃ হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ। সুতরাং কালবিলম্ব না করে ঝটপট বলে ফেল।

ঃ বলব তো অবশ্যই। তবে এর জন্য একটি সারপ্রাইজ চাই।

ঃ তুমি যা চাও তাই দিব। বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি বল।

স্ত্রী বলতে লাগল, শুনুন তাহলে-

আপনি নামাজে চলে যাওয়ার একটু পরই দেখলাম, একটি নেকড়ে বাঘ আমাদের ঘোড়াটির পিছু নিয়েছে। আর ঘোড়াটি জীবন বাঁচানোর তাগিদে দ্রুত গতিতে দৌড়ে এসে আস্তাবলে প্রবেশ করেছে। আমরা তা দেখতে পেয়ে ঘোড়াটি বেঁধে ফেলি এবং নেকড়েটিকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেই।

আব্দুল আজিজ স্ত্রীর কথা শুনে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর আটার বস্তা সম্পর্কে জানতে চাইলে স্ত্রী বলল-

আমাদের পাশের বাড়ির বড় ভাই তাদের আটার বস্তা আনার জন্য মিলে গিয়েছিল। কিন্তু ভুলবশতঃ আমাদের আটার বস্তা নিয়ে চলে এসেছে। বাড়িতে আনার পর ভুল বুঝতে পেরে আমাদের বাসায় দিয়ে গেছে।

স্ত্রীর কথায় আবারো আব্দুল আজীজ আলহামদু লিল্লাহ বলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। তারপর বললেন, জমিনে পানি দেওয়ার ব্যাপারে তুমি কিছু জান কি?

স্ত্রী বলল হ্যাঁ, সেটাও আমার অজানা নেই। মেশিনের মালিক আমাদের পাশের জমিনে পানি দেওয়ার জন্য মেশিন চালু করে গাছের

ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ পর জমিন পূর্ণ হয়ে আইলের উপর দিয়ে পানি এসে আমাদের জমিনও ভরে দেয়। আপনি আসার কিছুক্ষণ পূর্বে জমিওয়ালা এসে তা বলে গেল।

এতক্ষণে আব্দুল আজীজের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। স্ত্রীর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে হাত-মুখ ধুয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঘরে গিয়ে দু' রাকাত শোকরানা নামাজ পড়ে হাত উঠিয়ে বললেন, ওগো রাহমানুর রাহীম! তোমার অসীম করুণায় আমার কাজগুলোকে তুমি সহজে সমাধান করে দিয়েছ। আজকের এই ঘটনার দ্বারা তোমার ওয়াদার প্রতি আমার বিশ্বাস আরও মজবুত হয়েছে। যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন যেন এ বিশ্বাস বুকে ধারণ করে তদানুযায়ী আমল করে যেতে পারি সে তাওফীক দান কর।

প্রিয় পাঠক ভাই ও বোনেরা! জীবন পথে চলতে গিয়ে আমরাও অনেক সময় এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হই। অর্থাৎ দ্বীন ও দুনিয়ার কাজ উভয়টি একই সময়ে একই সাথে সম্পাদন করা জরুরি হয়ে পড়ে। আলোচ্য ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে তখন যদি দুনিয়ার উপর দ্বীনকে প্রাধান্য দিয়ে দ্বীনের কাজটিই আগে সমাধা করি, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হব। ফলে দুনিয়ার কাজটিও অতি সহজে সমাধান হয়ে যাবে। অথবা বান্দার জন্য যা কল্যাণকর তাই খোদার পক্ষ থেকে ফয়সালা হবে। অবশ্য এজন্য প্রয়োজন হবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার প্রতি অবিচল আস্থা ও অটল বিশ্বাস। একীন করতে হবে উত্তমরূপে আমল করার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার যাবতীয় সমস্যা সমাধানের সুন্দর ও সহজ রাস্তা বের হয়। ওগো সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান খোদা! তুমি আমাদের বুঝার শক্তি দাও। বর্ণিত পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাওফীক দাও। আমীন। ইয়া রাব্বুল আলামীন।

[সূত্র ঃ আলোচ্য ঘটনাটি কোন এক বয়ানে আমার নিজ কানে শুনা একটি বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।]

কিশোর শ্রমিকের দ্বীনদারী

সোমবার। বেলা আটটা। প্রভাতের আলো এখন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাখিরা নীড় ছেড়ে ডানা মেলে আকাশে উড়ছে। খন্ড খন্ড মেঘের ফাঁকে পৃথিবীটাকে ঠিক ছবির মতই মনে হচ্ছে।

শাইখ আবু আব্দুল্লাহর আম্মা সুবহে সাদিকের বেশ আগেই ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েছেন। এ সময় উঠে তাহাজ্জুদ পড়া, রোনাজারী করা, অতঃপর কুরআন তিলাওয়াত শেষে ফজরের নামাজ আদায় করা তার নিয়মিত অভ্যাস। অসুস্থতা কিংবা বিশেষ কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম কখনোই করেন না। তিনি বেশ সাদাসিধে মহিলা। স্বামী খুশিমত স্বেচ্ছায় যা কিছু এনে দেন তার উপরই সন্তুষ্ট থাকেন। অলংকার ও গয়না-ঘাটি থেকে শুরু করে ছোট-খাটো সদাই-পাতির ব্যাপারে স্বামীর পছন্দকেই প্রাধান্য দেন। স্বামীর মতের বাইরে কিছুই তিনি করতে যান না। ফলে তাদের দাম্পত্য জীবনের সুখ দিন দিন কেবল বেড়েই চলছে।

ঐদিন ফজরের নামায আদায়ের পর হঠাৎ কেন জানি আবু আব্দুল্লাহর মায়ের মাছ খাওয়ার সখ জাগল। তবে ছোট মাছ নয়, বিশাল আকারের বড় মাছ। কিন্তু মাছ খাওয়ার সখ জাগার সাথে সাথে তিনি ভাবতে লাগলেন, কোন দিন তো স্বামীর কাছে কিছু চাইনি, আজ কি করে মাছের কথা বলব? না, থাক বলার প্রয়োজন নেই। এ বলে তিনি বিভিন্ন উপায়ে মনকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু মন আজ কিছুতেই বুঝ মানতে চাইছে না। তাকে যতই বুঝানো হচ্ছে, বড় মাছের প্রতি তার আগ্রহ ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত মনের কাছে পরাজিত হয়ে স্বামীর নিকট তা ব্যক্ত করারই সিদ্ধান্ত নিলেন।

আবু আব্দুল্লাহর আব্বা তখন ঘরে ছিলেন না। সেই যে ফজর পড়তে মসজিদে গেছেন এখনো ফিরেন নি। অবশ্য না ফেরার কারণও আছে। কারণ প্রতিদিন তিনি নামাজের পর তাসবীহ তাহলীল ও ইশরাক আদায় শেষে পাড়া-প্রতিবেশীদের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েন। অতঃপর তাদের কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধান করার চেষ্টা করেন। এসব করতে করতে বাসায় ফিরতে প্রায় আটটা নয়টা বেজে যায়। সুতরাং আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

স্বামী ঘরে আসলে স্ত্রী তাকে খেতে দিল। তারপর স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী নির্জন কক্ষে প্রবেশ করে দু'জনই সুখ সাগরে ভেসে চলল। তারপর এক পর্যায়ে স্ত্রী যখন বুঝল মনের কথাটি প্রকাশ করার এখনই উপযুক্ত সময় তখন বলল-

ঃ ওগো প্রিয়তম! আজ সকাল থেকে একটা সখ মনের মধ্যে চেপে বসেছে। তা দূর করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু সফল হতে পারি নি। তাই শেষ পর্যন্ত আপনার নিকট বলার ইচ্ছা করলাম এখন আপনি অনুমতি দিলে বলতে পারি।

ঃ তুমি আমার প্রিয়তমা। নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসি তোমাকে। আর তুমি কিনা একটা সখের কথা বলতে এতটা ইতস্তঃ করছ? এ তো বড়ই আশ্চর্যের কথা!

ঃ কোন সময় এমন কথা বলি নি তো, তাই এমন লাগছে।

ঃ যাক আর দেরী করে লাভ নেই। তাড়াতাড়ি বলে ফেল।

ঃ বিশাল আকৃতির একটি বড় মাছ খেতে চেয়েছিলাম।

ঃ ও তাই! এটুকু বলতেই তোমার এত ভয়। যাও কথা দিলাম, যেভাবেই হোক তোমার আশা পূর্ণ করব, ইনশাআল্লাহ।

এতক্ষণ আমি আবু আব্দুল্লাহ বলে যার নাম কয়েকবার উল্লেখ করেছি তিনি ছিলেন একজন আল্লাহ প্রেমিক ও উঁচু স্তরের বুযুর্গ। আলোচ্য ঘটনাটি তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, একটু পর আব্বা বাজারে গেলেন। সাথে আমাকেও নিলেন। আমি তখন ছোট ছিলাম। ভাগ্য আমাদের ভালই বলতে হবে। কারণ অন্য বাজারে যেতে হয়নি, এ বাজারেই আমাদের পছন্দমত একটি বিশাল আকৃতির মাছ পেয়ে যাই। আব্বা দাম দর করে মাছটি কিনে নেন। মাছটি এতই বড় ছিল যে, হাতে করে আনা সম্ভব ছিল না। বড় কোন পাত্রে রেখে মাথায় উঠিয়ে আনতে হবে। তাই আব্বাজান একজন মজদুর খুঁজতে লাগলেন।

আমাদের পাশেই একটি অল্প বয়সের কিশোর দাঁড়ানো ছিল। সে বলল, আপনি কি কুলি খুঁজ করছেন? আব্বা হ্যাঁ বলতেই সে বলল, মাছটা আমার মাথায় তুলে দিন আমি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব।

আমাদের বাড়ি থেকে বাজার ছিল বেশ দূরে। তাই সেখানে পৌঁছে মাছ কিনতে কিনতে প্রায় বারটা বেজে যায়। ছেলেটির মাথায় মাছ উঠিয়ে দেওয়ার পর সে আমাদের আগে আগে বাড়ি অভিমূখে চলছিল। বেশ কিছু পথ অতিক্রম করার পর পার্শ্ববর্তী একটি মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আল্লাহু আকবার ধ্বনি শোনা গেল। আযানের আওয়াজ শোনার সাথে সাথেই ছেলেটি দাঁড়িয়ে গেল এবং মাছটি মাথার উপর থেকে নিচে নামিয়ে রাখল।

ছেলেটির কাজ দেখে আমরা ভাবলাম, ছোট মানুষ, বড়জোর বার-তের বছর বয়স হবে। মাছ নিয়ে এত পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্যই বোধ হয় এরূপ করেছে।

কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হল। ছেলেটি বলল, চাচাজান! আপনাদের যদি বিলম্ব করা সম্ভব হয় তবে করুন, অন্যথায় অন্য কোন কুলির দ্বারা মাছটি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। ছেলেটির কথা শুনে আব্বা বললেন- কেন, কি হয়েছে তোমার?

ঃ না, তেমন কিছুই হয়নি আমার। মসজিদে আযান হয়েছে। আযানের আওয়াজ আপনারাও নিশ্চয় শুনতে পেয়েছেন। আমি এখন মসজিদে যাব। জামাতের সাথে নামাজ পড়ব। কাজ যত গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, আযানের পর আমার নিকট নামাজের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ থাকে না। একথা বলে কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে ছেলেটি দ্রুত মসজিদে চলে গেল।

এ ছোট্ট ছেলের দ্বীনদারী দেখে আমরা আশ্চর্য হলাম। তার চলে যাওয়ার পথের দিকে কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। তারপর আব্বা আমাকে বললেন, এসো বাবা আমরাও নামাজ পড়ে নেই। মাছটা এখানেই থাক। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা থাকলে আমরা পুনরায় মাছটি এখানেই পাব। এটা কত বড় লজ্জার কথা যে, শ্রমিক ছেলেটি নিজের পারিশ্রমিকের কথা না ভেবে আজান শোনার সাথে সাথে মসজিদে চলে গেল, আর আমরা মাছের কথা চিন্তা করে জামাত ছেড়ে দিব? এটা কিছুতেই হতে পারে না।

ছেলেটির পিছনে পিছনে আমরাও মসজিদে গেলাম। ধীরস্থিরে নামাজ পড়লাম। তারপর ছেলেটিকে নিয়ে ফিরে এসে দেখলাম, মাছটি যেভাবে রেখে গিয়ে ছিলাম সেভাবেই পড়ে আছে।

আমরা নামাজ পড়তে যাওয়ায় ছেলেটি বেশ খুশি হল। বলল, আল্লাহর হুকুম ঠিক ঠিক মত পালন করলে তিনিই বান্দার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করেন। যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দেন। একথা বলে মাছটি মাথায় নিয়ে ছেলেটি আবার আমাদের সাথে চলতে লাগল এবং অল্প সময়ের মধ্যে বাসায় পৌঁছে গেল।

আব্বাজান বাড়িতে পৌঁছেই ছেলেটির সব ঘটনা আম্মাকে শোনালেন। আম্মা তাতে বেশ আশ্চর্যবোধ করলেন এবং বললেন- হ্যাঁ, ছেলে হলে তো এমনই হওয়া চাই। ঐ মা কতই না ভাগ্যবান যিনি এ ছেলেটিকে গর্ভে ধারণ করেছেন। আমার মনে হয়, ছেলেটি বুযুর্গ হবে। আপনি তাকে থাকতে বলুন। অল্প সময়ের মধ্যে মাছ রান্না শেষ হয়ে যাবে। এরূপ দ্বীনদার ছেলেকে একবেলা খাওয়াতে না পারলে মনে স্বস্তি পাব না।

আব্বা ছেলেটির কাছে এসে বললেন, বাবা! কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। মাছ পাকানো হচ্ছে। খেয়ে যাবে।

ছেলেটি শান্ত স্বরে বলল, চাচাজান আমার পক্ষে তা সম্ভব হবে না। কারণ আমি রোজা রেখেছি। তার রোযার কথা শুনে আমরা আরও আশ্চর্য হলাম। এরপর আব্বাজান তাকে বললেন, ঠিক আছে, আজ তাহলে আমাদের বাসায় ইফতার করবে।

ছেলেটি জবাবে বলল, ওয়াদা দিতে পারব না। তবে সন্ধ্যায় যদি

কাছাকাছি কোন মসজিদে নামাজ পড়ি তাহলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আপনার আশা পূর্ণ করব। এ বলে সে চলে গেল। আব্বাজান তাকে কিছু পারিশ্রমিক দিয়ে দিলেন।

মেঘশূন্য আকাশ। বৈকালের শেষ সূর্যাস্তের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়ছিল সকলের চোখেমুখে। এলোমেলো বাতাসে দেহমন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। আমরা ভেবেছিলাম, ছেলেটি আমাদের এখানে এসে ইফতার করবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, ছেলের যে দ্বীনদারী দেখলাম, তাতে বোধ হয় তাকবীরে উলা ছুটে যাওয়ার ভয়ে কিছুতেই এখানে ইফতার করতে আসবে না। তাই মসজিদে গিয়ে মাগরিবের নামাজ আদায় করে বাসায় এলাম এবং সকলে মিলে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমরা এমন আগ্রহ সহকারে তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, যেমন কোন সম্মানিত অতিথির জন্য অপেক্ষা করা হয়।

নামাজের পর বেশি দেরী হল না। ফরজের পর সুন্নত ও ৬ রাকাত আউয়াবিন আদায় এবং বাড়ি পর্যন্ত আসতে যতটুকু সময় লাগার কথা ঠিক ততটুকু সময় পর ছেলেটি আমাদের নিকট উপস্থিত হল। আমরা তার আগমনে খুব খুশি হলাম এবং তাকে উত্তমভাবে খানা খাওয়ালাম। এরপর পাশের খালি কামরায় রাত্রি যাপনের আমন্ত্রণ জানালাম। সে আমাদের আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করল এবং রাত্রি যাপনের জন্য কক্ষে প্রবেশ করল।

পরদিন সকালে ঘটল এক আশ্চর্য জনক ঘটনা। আমাদের পাশের বাড়িতে বাস করত একজন মহিলা। তার উভয় পা ছিল সম্পুর্ণ বিকল। দু' কদম হেঁটে কোথাও যাওয়ার শক্তি ছিল না তার। এক সময় এই মহিলাকে সুস্থ করে তোলার জন্য বহু টাকা পয়সা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। অবশেষে আত্মীয়-স্বজনরা তার আরোগ্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে চিকিৎসাই বন্ধ করে দিয়েছে। তার নিজের মনের মধ্যেও এ ধারণা জন্মেছে যে, হয়তো কোন দিন সে ভাল হবে না।

ছেলেটির দ্বীনদারীর কথা উক্ত মহিলাটি রাতেই শুনেছিল। এতে তার মনে আশার সঞ্চার হল। ভাবল, নিশ্চয় ছেলেটি আল্লাহর আশেক বান্দা হবে। তার ওসীলায় দুআ করলে আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে আমাকে সুস্থও করে দিতে পারেন।

এ কথা মনে হতেই মহিলা দুআর জন্য হাত উঠাল। তারপর বড়ই কাকুতি মিনতি করে কেঁদে কেঁদে বলল, হে পরওয়ার দিগার! তোমার ঐ নেক বান্দার অসিলায় আমাকে সুস্থ করে দাও।

আল্লাহ্ পাক মহাপরাক্রমশালী। যা ইচ্ছে তাই পারেন। তবে অনেক সময় কাউকে কিছু দেওয়ার জন্য বাহানা তালাশ করেন। মহিলার বেলাও তাই হল। সে যখন বালক বুযুর্গের অসিলায় দুআ করল তখন আল্লাহ্ পাকের রহমতের সাগরে জোশ উঠল। তাই সাথে সাথে তিনি মহিলার পা দুটো ভাল করে দিলেন।

ভোর বেলা মহিলা আমাদের বাড়িতে এল। সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তাকে দেখে বুঝার কোন উপায় নেই যে, সে কখনো রোগাক্রান্ত ছিল। তাকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। সুতরাং প্রকৃত ঘটনা কি? কিরূপে সে এমন সুস্থ সবল হয়ে গেল- তা জানার জন্য সকলের মনে কৌতুহল জাগল।

আমরা মহিলাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার পর সে সবকিছু খুলে বলল। এতে ছেলেটির প্রতি আমাদের ধারণা আরো সুন্দর ও উঁচু হল। মনের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাল, ছেলেটি নিশ্চয় আল্লাহর অলী- খাঁটি বান্দা। তাই তার কাছে গিয়ে আমাদের সকলের দুআ নেওয়া উচিত।

এসব কথা চিন্তা করে আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম। তারপর হেঁটে গিয়ে ছেলেটির কামরার সামনে উপস্থিত হলাম। আমাদের ভাগ্য মন্দই বলতে হবে। কারণ সেখানে গিয়ে দেখি, কামরার দরজা বন্ধ এবং ভিতরে কোন লোক নেই। কখন যে সে চলে গেছে আমরা কেউ টেরও পেলাম না। তাকে না পেয়ে খুবই আফসোস করলাম এবং ব্যথিত মনে ফিরে এলাম।

সুপ্রিয় পাঠক! আমরা অনেক সময় ভাবি, বয়স না হলে, দাড়ি না পাকলে আল্লাহর ওলী হওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের এ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল আলোচ্য ঘটনাই তার বাস্তব প্রমাণ। তাই আসুন, আমরা আমাদের অন্তরে এ কথার স্থান দেই যে, বুযুর্গ তথা আল্লাহ প্রেমিক হওয়া, বয়সের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বালেগ হওয়ার পর যে কোন বয়সেই বুযুর্গ হওয়া যায়। অতএব আমাদের যার বয়স যতই হউক না কেন, আজ থেকে আমরা আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য এরাদা করি এবং সেজন্য যথাপোযুক্ত চেষ্টাও করতে থাকি।

অনেকেই হয়তো ভাবেন, আল্লাহর ওলী হওয়া না জানি কত কঠিন কাজ, আমাদের পক্ষে ওলী-বুযুর্গ হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। অথচ ব্যাপারটি মোটেও এমন নয়। যারা ওলী হয়েছেন তারাও তো মানুষ। সুতরাং তারা পারলে আমরা পারব না কেন? আসল ব্যাপার হল, এজন্য প্রথমে পাক্কা ইরাদা ও খাঁটি নিয়ত করতে হয়। তারপর নিম্ন লিখিত ৫টি কাজ আমলে আনতে পারলেই বুযুর্গ হওয়া যায়। আখ্যা পাওয়া যায় আল্লাহ্ প্রেমিক বা তাঁর খাঁটি বান্দা হিসেবে। তাই আসুন কাজগুলো জেনে নেই এবং তা আজ থেকেই পালন শুরু করে দিয়ে ধাপে ধাপে সম্মুখে অগ্রসর হই। মনে রাখবেন, আপনি যখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসব আমল পালন করতে শুরু করবেন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যই সাহায্য প্রাপ্ত হবেন। অর্থাৎ এসব আমল বাস্তবায়ন করা আল্লাহ্ তাআলা আপনার জন্য অনেক সহজ করে দিবেন। কাজগুলো হল-

১। আল্লাহ্ ওয়ালাদের সোহবত অবলম্বন করা ঃ অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যারা সদা-সর্বদা আল্লাহর হুকুম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপনের চেষ্টা করেন তাদের সাথে মহব্বত রাখা, সময় সুযোগ করে সাক্ষাত করা এবং তাদের মজলিশে বেশী বেশী বসা।

২। সকল প্রকার জাহেরী ও বাতেনী গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা ঃ অর্থাৎ প্রকাশ্য গোপনীয় যত প্রকার গোনাহ আছে সব ধরনের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। যদি কোন সময় প্রবৃত্তির তাড়নায় কিংবা শয়তানের ধোকায় পড়ে কোন গোনাহ হয়েই যায় তবে সাথে সাথে তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, গোনাহের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে গোনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন গোনাহ থেকে তাওবাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার কোন গোনাহই নেই।

৩। গোনাহের উপকরণ থেকেও দূরে থাকা ঃ অর্থাৎ যেসব জিনিস গোনাহ করতে প্ররোচিত করে, গোনাহের পথ সুগম করে ঐসব জিনিস থেকেও বেঁচে থাকা। ব্যাপারটি পরিস্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

(ক) যেমন ধরুন, কেউ সখ করে কিংবা অন্য যে কোন কারণে একটি টেলিভিশন ক্রয় করে ঘরে নিয়ে এল। ঘরে টেলিভিশন থাকার কারণে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এখন তাকে এমন সব দৃশ্যও দেখতে হয় বা গান বাজনা সহ এমন কথাও শুনতে হয় যা দেখা বা শুনা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ না জায়েজ ও হারাম। অথচ যদি তার ঘরে এটি না-ই থাকত তবে টেলিভিশনকে কেন্দ্র করে এত লক্ষ-কোটি পাপ তার আমল নামায় লিখা হত না। তাছাড়া এর কারণে অন্যরা সবাই মিলে যত পাপ করবে তার সমপরিমাণ পাপও তার আমল নামায় লিখা হবে। কারণ টেলিভিশন নামক এ গোনাহের বাক্সটি ঘরের আনার ব্যাপারে তার ভূমিকাই সর্বাধিক ছিল।

(খ) কেউ হয়তো আয় উপার্জনের জন্য এমন এক স্থান বা পরিবেশ বেছে নিয়েছে যেখানে কারণে অকারণে মিথ্যা বলতে হয়, পর্দা-পুশিদার কোন বালাই নেই, মেয়ে ছেলেদের আনাগোনা বেশি, ইচ্ছা করলেই ঘুষ খাওয়া যায়, কামাই করা যায় অবৈধ পয়সা ইত্যাদি। অথচ সে যদি উক্ত পেশা বা স্থানে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে একটু চিন্তা করে নিত যে, সেখানে গিয়ে আমার ঈমান-আমল ঠিক রাখতে পারব তো? আমার উপার্জনগুলো একশ ভাগ বৈধ হবে তো? দৃষ্টির হেফাজত করা সম্ভব হবে তো? তাহলে তার জন্য আল্লাহপাক অবশ্যই অন্য কোন রাস্তা খুলে দিতেন। কেননা হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ পাক তাকে পবিত্র রাখেন।

(গ) অথবা কেউ হয়তো এমন এক বন্ধু নির্বাচন করল, যে নাকি সর্বদা তাকে অন্যায় ও অবৈধ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এমনকি ভাল কাজে বাধা প্রদান করতেও দ্বিধাবোধ করে না। সুতরাং এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ঐ ব্যক্তির গোনাহের পাল্লাকে ভারী করার পিছনে ঐ বন্ধুটিও অনেকাংশে দায়ী।

এক কথায় মাথা না থাকলে যেমন মাথা ব্যাথার কোন প্রশ্ন উঠে না, তেমনি গোনাহ করার উপায়-উপকরণগুলো কাছে না রাখলেও গোনাহের পরিমান উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে।

৪। কোন আল্লাহ ওয়ালার পরামর্শ অনুযায়ী দৈনন্দিন নিয়মিত কিছু জিকির করা ঃ জিকির একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। ইবাদত সমূহের মধ্যে জিকিরই একমাত্র ইবাদত যার কোন সীমারেখা নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক খুব বেশি পরিমাণে জিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন। এক আয়াতে জিকিরকে অন্তরে প্রশান্তি আনয়নকারী বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। জিকির মানে আল্লাহকে স্মরণ করা। প্রকৃত কথা হলো, জিকির সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যদি কোন প্রকার নির্দেশ নাও আসত তবুও সেই দয়ালু দাতার জিকির থেকে ক্ষণিকের জন্যও গাফেল থাকা কোন বান্দার জন্য সঙ্গত ছিল না। কেননা তার সীমাহীন দান ও অনুগ্রহ প্রতি মুহূর্তেই বান্দার উপর বর্ষিত হচ্ছে। তদুপরি এ সম্পর্কে যখন কুরআন হাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীনের অসংখ্য বাণী ও হালত বর্ণিত হয়েছে তখন উহার নূর ও বরকত যে অফুরন্ত তা বলাই বাহুল্য।

জিকিরের প্রতি সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের উৎসাহ বৃদ্ধি ও গুরুত্ব সৃষ্টির জন্য নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকখানা আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হল।

আয়াত-১ ঃ (হে আমার বান্দাগণ!) তোমরা আমি আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করতে থাকব। আমার শুকরিয়া আদায় কর, অকৃতজ্ঞ হইও না। (সূরা বাকারা ঃ ৫২)

আয়াত-২ ঃ তোমরা বেশী বেশী আপন প্রভুকে স্মরণ করতে থাক এবং সকাল বিকাল তার পবিত্রতা বর্ণনা কর। (সূরা আল ইমরান ঃ ৪১)

আয়াত-৩ ঃ (হে মুহাম্মদ সা.) আপনি ঐ সমস্ত লোকের সহিত বসতে অভ্যস্ত হউন যারা সকাল বিকাল আল্লাহকে ডাকে। (সূরা কাহাফ ঃ ২৮)

আয়াত-৪ ঃ (মুমিনদের বিভিন্ন গুনাবলির মধ্যে এটাও একটি যে) তারা পুরুষ হউক কিংবা নারী হউক বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করে থাকে। তাদের সকলের জন্য আল্লাহ পাক ক্ষমা এবং মহা প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন

আয়াত-৫ ঃ যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর জিকির থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয় আমি তার জন্য একটি শয়তান নিযুক্ত করে দেই, অতঃপর সেই হয় তার সঙ্গী (সূরা যুখরুফ ঃ ৩৬)

আয়াত-৬ ঃ ঈমানদারদের জন্য ঐ সময় কি এখনও আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহর জিকিরের দিকে ঝুঁকে পড়বে? (সূরা হাদীদ ঃ ১৬)

আয়াত-৭ ঃ হে ঈমানদারগণ! ধন সম্পদ এবং সন্তান সন্তুতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল না রাখে, যারা এরূপ করবে তারা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (সূরা মুনাফিকুন ঃ ৯)

হাদীস-১ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা.) বলেন, এক সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! শরীয়তের আহকাম তো অনেক আছে, তবে আপনি আমাকে এমন একটা জিনিস শিক্ষা দিন যার উপর আমি রীতিমত আমল করতে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর জিকির দ্বারা তোমার জিহ্বা যেন সব সময় তরুতাজা থাকে। (তিরমিযি)

হাদীস-২ ঃ হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবীদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে এমন একটি আমলের কথা বলব না যা যাবতীয় আমল হতে উত্তম, তোমাদের মালিকের নিকট সবচেয়ে বেশি পবিত্র, তোমাদেরকে সর্বাধিক মর্যাদা দানকারী, আর আল্লাহর রাস্তায় স্বর্ণ রৌপ্য খরচ করার চেয়েও অধিক উত্তম, আর শত্রুর সাথে জিহাদ করার সময় পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করার চেয়েও অনেক ভাল। সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই বলুন। দয়াল নবী উত্তরে বললেন, তা হল আল্লাহর জিকির। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

হাদীস-৩ ঃ হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে আর যে ব্যক্তি জিকির করে না, তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের সমতুল্য (অর্থাৎ প্রথমজন জীবিত আর দ্বিতীয়জন মৃত সদৃশ। (বুখারী, মুসলিম)

জীবন সবার কাছে প্রিয় আর মৃত্যুকে সবাই ভয় করে। বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, যারা জিকির করে না, তারা জীবিত থেকেও মৃতের ন্যায়।

হাদীস-৪ ঃ হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বেহেশতবাসীগণ বেহেশতের মধ্যে কোন কিছুর জন্য আফসোস করবে না, তবে

(দুনিয়াতে) যে সময়টুকু আল্লাহর জিকির ব্যতীত অতিবাহিত হয়েছে তার জন্য আফসোস করবে। (তাবরানী, বায়হাকী)

হাদীস-৫ ঃ উপরি উক্ত সাহাবী থেকে বর্ণিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষকে কবরের আজাব থেকে নাজাত দানকারী আল্লাহর জিকির থেকে বড় আর কোন আমল নেই। (আহমদ)

হাদীস-৬ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা এত বেশি পরিমানে আল্লাহর জিকির করতে থাক যেন লোকজন তোমাকে পাগল বলতে থাকে। (আহমদ)

হাদীস-৭ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ পাক সাত ব্যক্তিকে আপন রহমতের ছায়ার নীচে আশ্রয় দান করবেন। তম্মধ্যে একজন হল ঐ ব্যক্তি যে নীরবে বসে আল্লাহর জিকির করে এবং তার চক্ষু হতে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে।

হাদীস-৮ ঃ উপরি উক্ত সাহাবী থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের এরশাদ নকল করে বলেন (হে আমার বান্দা!) তুমি ফজর ও আছর নামাজের পর কিছুক্ষণের জন্য আমার জিকিরে মশগুল থাক। আমি মধ্যবর্তী সময়ের জন্য তোমার যাবতীয় প্রয়োজন মিটিয়ে দেব। (আহমদ)

এ হাদীসের আলোচনায় শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র.) বলেন, দুনিয়ার স্বার্থের জন্য আমরা কতই না কষ্ট স্বীকার করে থাকি। ফজর এবং আছরের পর যদি সামান্যটুকু সময় আমরা জিকিরে কাটিয়ে দেই তবে এমন কি বিগড়ে যায়! উপরন্তু মহান আল্লাহ তাআলা যখন প্রয়োজন মেটানোর ওয়াদা করেছেন তখন আবার প্রয়োজনই বা থাকে কিসের?

হাদীস-৯ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (রা.) বলেছেন, শয়তান বনী আদমের অন্তরে জেকে বসে থাকে। অতঃপর-সে যখন জিকির করে তখন শয়তান পালিয়ে যায়। পক্ষান্তরে যখন সে গাফেল অর্থাৎ জিকির বিহীন অবস্থায় থাকে তখন শয়তান তার অন্তরে বিভিন্ন রকমের ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। (অর্থাৎ ধোকা ও নানাবিধ অশ্লীল চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক করে।)

প্রিয় পাঠক! উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, জিকির হল এমন এক আমল যদ্বারা অন্তরে শান্তি আসে, শয়তান পাপকর্মে লিপ্ত করানোর সুযোগ পায় না, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার যাবতীয় হাজত পূর্ণ হয়ে যায়। তাছাড়া আরও হাজারো ফায়েদা তো আছেই। তাই আসুন, আল্লাহর ওলী হওয়ার চতুর্থ কাজ হিসেবে আমরা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির পরামর্শ ক্রমে প্রতিদিন নিয়মিত কিছু সময় হলেও জিকির করি।

৫। সমস্ত কাজ সুন্নত মোতাবেক করা ঃ আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য সর্বশেষ যে কাজটি আপনাকে করতে হবে তা হল, যাবতীয় কাজ সুন্নত মোতাবেক করা। অর্থাৎ সকাল থেকে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত আপনি যতগুলো (বৈধ) কাজ করে থাকেন, সেসব কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে, যে নিয়মে, যে তরীকায় সম্পাদন করেছেন আপনাকেও সেভাবে সেই নিয়মেই করতে হবে। তারা যেভাবে হেসেছেন, যেভাবে কেঁদেছেন, যেভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন, যেভাবে খানা-পিনা করেছেন, যেভাবে ঘুমিয়েছেন, যেভাবে পথ চলেছেন, যেভাবে লেনদেন ও আচার আচরণ করছেন, যেভাবে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পাদন করেছেন আপনাকেও ঠিক সেভাবেই তা সম্পাদন করতে হবে। আর এটি মোটেও কোন কঠিন বা দূরহ কাজ নয়। এর জন্য শুধু আপনার সদিচ্ছা ও দৃঢ় সংকল্প প্রয়োজন। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, হুজুর! এত সব সুন্নত পাব কোথায়? আমাদের তো সব কাজের সব সুন্নত জানা নেই।

এর জবাবে আমি খুশির সাথে বলব, বর্তমানে সুন্নতের উপর বাংলা ভাষায় অনেক বই বের হয়ে গেছে। যেমন- বয়ানুস্ সুনান, জাওয়ামিউস্ সুনান, গুলজারে সুন্নত, প্রিয় নবীর প্রিয় সুন্নত ইত্যাদি। আপনি ইচ্ছা করলেই এসব বই আপনার হাতের নাগালে চলে আসতে পারে। আর যদি একেও ঝামেলা মনে করেন, তবে আমার ঠিকানায় চিঠি লিখুন কিংবা ফোন করুন। ইনশাআল্লাহ আমি যেভাবেই হোক সেগুলো সংগ্রহ করে সুলভ মূল্যে ডাকযোগে আপনার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব।

মুহতারাম পাঠক! প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বুযুর্গী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। তাই আসুন, আমরা আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত ছাড়া কোন কাজ করব না। একটি ১২/১৩ বছরের বালক যদি মেহনত মোজাহাদা করে বুযুর্গ হতে পারে তাহলে আমাদের মত যুবক-যুবতী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তা পারবে না কেন? অবশ্যই পারব। ওগো বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক! তুমি আমাদের হিম্মত দাও, সাহস দাও, শক্তি দাও, বল দাও। আপন অনুগ্রহে আমাদেরকে তোমার খাঁটি বান্দা হিসাবে কবুল করে নাও। আমিন।

বিঃ দ্রঃ এখানে ওলী হওয়ার জন্য যে পাঁচটি কাজের কথা উল্লেখ করা হল, তা আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) এর কথা। আমি বিষয়গুলো উত্তমরূপে বুঝে আসার জন্য একটু ব্যাখ্যা করে দিলাম মাত্র। -লেখক

[সূত্র ঃ ইন্তিখাব, রৌশন সেতারে, সহায়তায় ঃ ফয়জুল কালাম, ফাযায়েলে জিকির, ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে, তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন।]

বিশ্বস্ত রাখাল

বেশ কিছুদিন পূর্বে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রা.) এখন মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা। লোকেরা খলীফাকে আমীরুল মুমেনীন বলে ডাকে, বিভিন্ন অভাব অভিযোগ পেশ করে নিজেদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে নেয়। আর অন্যায়কারী ও জালিমরা ভোগ করে কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি।

হযরত ওমর (রা.) এর চমৎকার একটা অভ্যাস ছিল। সময় পেলেই তিনি শহরের অলি গলিতে ঘুরে বেড়াতেন। কখনও বা চলে যেতেন শহরের বাইরে, একেবারে পল্লী এলাকায়। সেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন, তাদের খোঁজ খবর নিতেন। যারা অভাব অনটনে আছে তাদের অভাব দূর করতেন। যারা রুগ্ন-অসুস্থ তাদের সেবা যত্ন করতেন। কোথাও অন্যায় অবিচার দেখলে তার প্রতিকার করতেন।

একদিন হযরত ওমর (রা.) চলতে চলতে শহরের বাইরে বহুদূর চলে গেছেন। সাথে কোন সফরসঙ্গী ছিল না। অনেক পথ চলার কারণে এক সময় তার প্রচন্ড ক্ষুধা লাগল। ধুধু মরু প্রান্তরে কোথাও কোন লোকালয় চোখে পড়ছে না। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তিনি অস্থির। মুখে দেওয়ার মত দু'মুটো খাবারও কাছে নেই। এবার তাহলে উপায়?

হযরত ওমর (রা.) ক্ষুধা পিপাসায় কতর হয়েও সামনে চলতে লাগলেন। বেশ কিছু পথ অগ্রসর হওয়ার পর একটি বকরির পাল নজরে

পড়ল। মনে মনে ভাবলেন, বকরির মালিক থেকে কিছু দুধ নিয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবৃত করবেন। তাই সেখানে গিয়ে বললেন, ভাই! আমি একজন মুসাফির। সাথে কোন খাবার নেই। আমার বেশ ক্ষুধা পেয়েছে। যদি তুমি অনুগ্রহ করে কিছু পয়সার বিনিময়ে আমাকে সামান্য দুধ দাও তবে বড়ই উপকৃত হব।

উত্তরে লোকটি বলল, হে সম্মানিত অতিথি! আমি অবশ্যই আপনার আবেদন পূর্ণ করতাম, দুধ পান করিয়ে আপনার ক্ষুধার যন্ত্রণা দূর করতাম। কিন্তু দুঃখ লাগছে এজন্য যে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি তা পারছি না। কারণ এসব বকরির মালিক আমি নই, রাখাল মাত্র। সুতরাং আপনিই বলুন, মালিকের অনুমতি ব্যতীত দুগ্ধ দোহন করে কিভাবে আপনাকে তা পান করাব?

রাখালের সততায় একটা খুশি দোলা দিয়ে যায় খলীফার অন্তরে। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠে একটা মৃদু ক্ষীণ হাসির রেখা। অভূতপূর্ব আনন্দে হৃদয় মন নেচে উঠে তার। সেই সাথে ভুলে যান ক্ষুদ পিপাসার যন্ত্রণার কথাও।

হযরত ওমর (রা.) কিছুক্ষণ নির্বাক দৃষ্টিতে রাখালের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর তাকে আরেকটু পরীক্ষা করার জন্য বলেন, যদি আমার কথা মত কাজ কর, তবে তোমাকে দারুণ একটি প্রস্তাব শুনাব। বুঝতেই পারছ, প্রস্তাবটি নিশ্চয় লাভজনক হবে।

রাখাল বলল, বলুন আপনার কি প্রস্তাব। খলীফা বললেন, তুমি একটি বকরি আমার নিকট বিক্রি কর। বকরির মূল্য এখনই তোমাকে দিয়ে দেব। এতে বকরি দোহন করে আমি যেমন দুধ পান করতে পারব তেমনি প্রয়োজন হলে তা জবাই করেও খেতে পারব। পরে মালিক তোমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বলবে একে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আর বাঘ তো বকরির উপর হামলা করেই থাকে।

বাঘ আসলেই বকরি খেল কি-না, তা তো মালিক আর যাচাই করে দেখবে না। আর যাচাই করবেই বা কেমন করে? এখন তো তোমার সাথে অন্য কোন রাখাল নেই যে, তার কাছে মালিক জিজ্ঞেস করে প্রকৃত অবস্থা অবগত হবেন। এদিকে আমার দেয়া অর্থগুলো তোমার নিকট থাকলে বিপদে আপদে অনেক উপকারে আসবে। প্রয়োজনে খরচ করতে পারবে।

www.smfoundationbd.com

ইচ্ছে হলে, পরিবারের লোকদের জন্য ভাল কোন জিনিস ক্রয় করে নিবে। এতে তারা তোমার উপর সীমাহীন খুশি হবে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাবে। মোটকথা, আমার এ প্রস্তাবটি তোমার জন্য বড়ই কল্যাণ বয়ে আনবে। সেই সাথে আমারও কিছু উপকার হয়ে যাবে।

রাখাল খলীফাকে চিনতে পারেনি। সে এতক্ষণ তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। খলীফার বক্তব্য শেষ হলে রাখাল বলল, ভাইজান! আপনার ধারণা মতে প্রস্তাবটি হয়তো বেশ সুন্দর এবং উভয়ের জন্য সুবিধাজনক। প্রস্তাবটি মেনে নিলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমার আপনার কিছু ফায়েদা হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার কথা হল, মিথ্যা বলে মালিককে না হয় প্রতারিত করতে পারব, তাকে বুঝিয়ে দিতে পারব, সত্যিই বকরিটিকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে, কিন্তু যিনি আমার মালিকেরও মালিক, যিনি সব কিছু দেখেন, শুনেন, বুঝেন সেই রাব্বুল আলামীন আল্লাহকে তো প্রতারিত করা যাবে না, পার পাওয়া যাবে না মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে। সুতরাং আমার পক্ষে আপনার প্রস্তাব মেনে নেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

রাখালের বক্তব্য শুনে আবারো অনাবিল এক আনন্দে আপ্লুত হল খলীফার হৃদয় মন। খুশির ঝাপটা তার সমস্ত অন্তরে একটা শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে গেল। বললেন তিনি, যতদিন এ পৃথিবীতে তোমার ন্যায় সৎ, আল্লাহ ভীরু ও বিশ্বস্ত মানুষ বিদ্যমান থাকবে, ততদিন এ জাতির উপর কোন বিপর্যয় নেমে আসবে না। মনে রেখো, যে পর্যন্ত মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয় থাকবে, সে পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে শান্তি ও স্থিতিশীলতা অবশিষ্ট থাকবে। আর যে দিন মানুষের হৃদয় থেকে জবাবদিহিতার ভয় বিলুপ্ত হবে সে দিন মানুষ আর মানুষ থাকবে না, হায়েনায় পরিণত হবে। হবে বাঘের ন্যায় হিংস্র ও রাক্ষসের ন্যায় রক্ত পিপাসু।

মুহতারাম পাঠক পাঠিকা! কোন গোনাহ করার সুযোগ এলে আমরাও যদি ঐ বিস্বস্ত রাখালের ন্যায় আল্লাহর উপস্থিতির কথা স্মরণ করি এবং তার নিকট জবাবদিহি করার ভয় করি তবেই আমরা খোদাভীরু হতে পারব, সফল হতে পারব দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানেই। হে আকাশ-বাতাস ও চন্দ্র-তারকার সৃষ্টি কর্তা। তুমি আমাদের তাওফীক দাও। আমীন।

[সূত্র ঃ ইসলাহী খুতুবাত- হযরত মাওলানা তাকী উসমানী (দামাত বারাকাতুহুম)]

আপন পর সবই সমান

সেদিন ছিল বাজারের দিন। হযরত ওমর (রা.) কি এক কাজে বাজারে গেছেন। এ গলি সে গলি দিয়ে হাঁটছেন। ঘুরে ঘুরে দেখছেন সমস্ত বাজারটা। বাজারে প্রচুর সওদা এসেছে। হরেক রকমের সওদা। কেউ কিনছে, কেউ বিক্রি করছে। দূর দূর অঞ্চল থেকে লোকজন বাজারে এসেছে। অসংখ্য লোকের আগমনে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে গোটা বাজার।

যারা খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রা.)কে চেনে তারা বিনীত ভাবে সালাম জানিয়ে একটু সরে দাঁড়ায়। তাঁর চলার পথকে সহজ করে দেয়। আর যারা চেনে না তারা অর্ধ জাহানের অধিপতি হযরত ওমর (রা.) কে ঠেলে ঠুলে পাশ কেটে সামনে এগিয়ে যায়। বেচা-কেনা নিয়ে সবাই ব্যস্ত। সবার মধ্যে বিরাজ করছে একটু চঞ্চলতা। বাজার থেকে সদাই-পাতি কিনে কার আগে কে বাড়ি ফিরবে এ যেন তারই প্রতিযোগিতা।

একটু পর। ক্রেতা বিক্রেতাদের ভিড় ঠেলে অলিগলি পার হয়ে হযরত ওমর (রা.) বাজারের অপর প্রান্তে একটু খোলামেলা জায়গায় এসে থামলেন। সেখানে ছিল অনেকগুলো উট। বিক্রির জন্যই এগুলো বাজারে আনা হয়েছে। ঘুরে ঘুরে তিনি উটগুলো দেখছিলেন। হঠাৎ খানিকটা দূরে

খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা একটি উট দেখে একেবারে তাজ্জব বনে গেলেন। উটটি যেমন সুন্দর, তেমনি হৃষ্টপুষ্ট। উচ্চতার পরিমানও অন্যগুলোর তুলনায় অনেক বেশী। এমন মোটা-সোটা স্বাস্থ্যবান উট দেখে খুবই খুশি হলেন তিনি। মনে মনে বললেন, বাজারের সবগুলো উটই যদি এমন মোটা তাজা হত, সবাই যদি এমন নিভাবে গৃহপালিত পশুর যত্ন নিত।

এতক্ষণ তিনি দূর থেকে উটটি দেখছিলেন। এবার এক পা দু'পা করে এগিয়ে গেলেন সেই উটটির কাছে। তারপর উটের রশি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ উটটি কার? এটি কি বিক্রি হয়ে গেছে?

লোকটি কার সঙ্গে কথা বলছে, কতটুকু তার মর্যাদা, কি পরিমাণ তার প্রভাব প্রতিপত্তি সে তা মোটেও জানত না। তাই সে ওমর (রা.)কেও একজন ক্রেতা বলে ভাবল। বলল-

ঃ না, এখনও বিক্রি হয় নি। দামদর চলছে। আপনার কি তা পছন্দ হয়েছে?

কথাগুলো এক শ্বাসে বলে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লোককে দেখিয়ে বলল, উনিই হলেন এ উটের মালিক।

উটের মালিকের দিকে তাকাতেই হযরত ওমর (রা.) একেবারে 'থ' হয়ে গেলেন। এ যে তাঁরই পুত্র আব্দুল্লাহ! মাথা নীচু করে চুপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে।

এ সময় হযরত উমর (রা.)এর সুন্দর দীপ্ত মুখ মন্ডলে চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠল। ভাবতে লাগলেন, আব্দুল্লাহ উট পেল কোথায়? তার উট এত মোটাতাজা হল কি করে? ঘাস খাওয়ানোর জন্য চারণ ভূমিই বা পেল কোথায়? হযরত ওমর (রা.) এসবের কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। শুধু একরাশ প্রশ্ন এসে তার মনের কোণে ভীড় জমাতে লাগল।

খানিক পর। পুত্র আব্দুল্লাহ নত মস্তকে এসে পিতার সামনে দাঁড়ালেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আব্দুল্লাহ! ঠিক করে বলতো আসলে এ উটটি কার?

ঃ এটি আমারই। হযরত আব্দুল্লাহ নরম সুরে জবাব দিলেন।

ঃ এমন সুন্দর ও নাদুস নুদুস উট কোথায় পেলে তুমি?

ঃ অনেক আগে আমি এটি কিনে ছিলাম।

ধীরে ধীরে হযরত ওমর (রা.) এর মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। পূর্বের হাসি আর আনন্দ ততক্ষণে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন-

ঃ তুমি উটটি এত মোটা তাজা করলে কিভাবে? কখনই বা এর সেবা যত্ন করলে?

ঃ চারণক্ষেত্র থেকে ঘাস খাইয়েছি। একটু মোটা সোটা হওয়ার পরই বিক্রির জন্য বাজারে এনেছি। ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) এর উত্তর।

স্তব্ধ নিঃশ্বাসে হযরত ওমর (রা.) কথাগুলো শুনলেন। সমস্ত মুখমন্ডল তাঁর কঠিন হয়ে উঠেছে। কণ্ঠে দৃঢ়তার ছাপ। চাহনিতে কঠোর শাসনের সুস্পষ্ট আভাস। তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ! এটা তোমার অন্যায় হয়েছে। তুমি যে চারণক্ষেত্রে উট লালন পালন করেছ তা সরকারি চারণক্ষেত্র। এটি জনগণের সম্পত্তি। আর জনগণের সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত উট চরানোর অধিকার তোমার নেই।

কথা কয়টি বলে হযরত ওমর (রা.) থামলেন। বাজারের বহু লোক ততক্ষণে জড়ো হয়েছে সেখানে। সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে খলীফার কথাগুলো শুনে। কিন্তু মুখ খুলে ভাল মন্দ দু কথা বলার সাহস পায় না। খলীফা পুত্র আব্দুল্লাহ সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। লজ্জায় তার নাক মুখ লাল হয়ে গেছে। করুণ কাতর আঁখি দুটি তুলে ধরেন খলীফার মুখে।

কিছুক্ষণ থেমে হযরত ওমর (রা.) আবার বলতে শুরু করলেন, আব্দুল্লাহ! উটটি মোটা তাজা বলে বেশ চড়া দামে বিক্রি হবে। উটের দাম তুমি পাবে ঠিক, কিন্তু বাড়তি মুনাফা যাবে বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগারে। কারণ তুমি সরকারী চারণভূমির সতেজ ঘাস খাইয়েই একে এমন স্বাস্থ্যবান ও হৃষ্টপুষ্ট করে তুলেছ। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) নিজের ভুল বুঝতে পারেন। নীরবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। পিতার কথা শেষ হলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানান।

উপস্থিত জনতা হযরত ওমর (রা.)এর আচরণে খুবই মুগ্ধ হয়। নিজেরা বলাবলি করে–খলীফার মত খলীফাই বটে। নইলে নিজের ছেলেকে কেউ এভাবে শাসন করতে পারে?

একজন বলে উঠল, দেশের শাসক এমনই হওয়া চাই। খলীফা ঠিক কাজটিই করেছেন। হোক না আব্দুল্লাহ নিজের ছেলে। তাই বলে তো সরকারি সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যায় না। সরকারি সম্পদের এমন অপব্যবহার খলীফা সইবেন কেন?

আরেকজন বলল, তোমরা তো কেবল খলীফার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আব্দুল্লাহর ব্যাপারটি একটুও খেয়াল করছ না। আব্দুল্লাহ কি এজন্য প্রশংসার দাবিদার নয় যে, সে একটুও মিথ্যা বলল না, সামান্য প্রতিবাদও করল না। বরং অকপটে নিজের দোষ স্বীকার করে বাড়তি আয়টুকু বায়তুল মালে জমা দেওয়ার জন্য সম্মত হয়ে গেছেন?

হ্যাঁ, তাই তো! এ দিকটি আমরা এতটা তলিয়ে চিন্তা করি নি। অন্যজন বলল।

প্রিয় পাঠক! আজকেও যদি পৃথিবীর দিকে দিকে এমন শাসক জন্ম নিতেন যাদের নিকট ইনসাফের মানদন্ডে আপন পর, আত্মীয় অনাত্মীয় সবই সমান, তবে কি এ ভূপৃষ্টের উপরে শান্তির হাওয়াটা আরেকটু প্রবল বেগে প্রবাহিত হত না? দেশের জনগণ কি আরামে দুটো আহার করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারত না? তাই আসুন, নেতৃত্বের আসনে কাউকে বসানোর পূর্বে একটু চিন্তা করে নেই তার মধ্যে খোদাভীরুতা ও ন্যায়পরায়ণতার গুণ পূর্ণ মাত্রায় আছে তো? তার শাসনে সত্য, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে তো? মুহতারাম পাঠক! ভোট কিংবা অন্য কোন উপায়ে কারো প্রতি আপনার সমর্থন ব্যক্ত করার পূর্বে এ বিষয়টি যাচাই বাছাই করে দেখা আপনার অপরিহার্য কর্তব্য। নচেৎ অবশ্যই আপনি আল্লাহর দরবারে পাকড়াও হবেন।

তিন বন্ধুর অমর কাহিনী

তিন বন্ধুর ছোট্ট দল। কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে সফরে বেরিয়েছে অনেক আগেই। বিরামহীন তাদের চলা। সে চলার যেন শেষ নেই। ইতি নেই।

সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি তখনও পৃথিবীর বুক থেকে মিলিয়ে যায়নি। একটু পরেই টুকটুকে লাল সূর্যটা বিদায় সালাম জানিয়ে হারিয়ে যাবে পাহাড় পর্বতের আড়ালে। তিমির আঁধারের কালো চাদরে ঢাকা পড়ে যাবে বসুন্ধরা। বেরিয়ে আসবে বিজন মরুর বুকে ওৎ পেতে থাকা হিংস্র হায়েনার দল। তাই নিরাপদ একটি আশ্রয়ের খোঁজে তিন বন্ধুই এদিক সেদিক ফেলতে লাগল তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি।

নিকটেই ছিল একটি পাহাড়। সামান্য এগুলেই তারা পৌঁছে যাবে পাহাড়ের পাদদেশে। এমন সময় গোটা আকাশ ছেয়ে যায় কালো কালো মেঘে। শুরু হয় কানফাটা গর্জন আর বিদ্যুতের ঝলকানি। সেই সাথে মুষলধারে বৃষ্টি। জীবন বাঁচানোর তাগিদে তারা দ্রুত ছুটে চলে পাহাড়ের দিকে। ভাগ্য অনেক ভাল। সেখানে যেতেই একটি গুহা নজরে পড়ে। বিলম্ব করার সময় নেই। মশাল জ্বালিয়ে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে কঠিন বিপদ মুহূর্তে রাত্রি যাপনের জন্য এমন সুন্দর জায়গা পেয়ে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে তারা।

গভীর রাত। এতক্ষণে দুর্যোগের ঘনঘটা কিছুটা কমে এলেও এখনো স্বাভাবিক হয়নি। রাতের খাবার শেষে তিন বন্ধুই ঘুমিয়ে পড়ছিল। দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে তারা। কিন্তু হঠাৎ একটি বিকট পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দে সবার ঘুম ভেঙ্গে যায়। মুহূর্তে একটা উৎকণ্ঠা ভাব ফুটে উঠে সকলের চোখে মুখে। অজানা ভয়ে সবাই শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে। অস্ফুট স্বরে বলতে থাকে- কোন অঘটন ঘটেনি তো?

প্রচন্ড আওয়াজে তাদের হৃদকম্পন শুরু হলেও একেবারে সাহস হারা হয়ে যায়নি। কালবিলম্ব না করে মশাল জ্বেলে তরবারী হাতে দ্রুত ছুটে যায় গুহা মুখে। কিন্তু একি! পথ যে বন্ধ! বাইরে বের হওয়ার কোন রাস্তা নেই। ভারী বর্ষণ আর প্রচন্ড ঝড়ের ফলে বিশাল এক পাথর পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে সে পথ। এবার তাহলে উপায়?

তিন বন্ধু মিলে গায়ের শক্তি ব্যয় করে পাথর খানা সরাতে চেষ্টা করল। কিন্তু মোটেও সফল হল না। নড়াতে পারল না এক চুল পরিমাণও। ফলে নিশ্চিত মৃত্যু ভয়ে আঁতকে উঠে সবার মন। বুক কাঁপতে থাকে থরথর করে।

তবে আল্লাহ পাকের উপর ছিল তাদের অগাধ বিশ্বাস। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও সে বিশ্বাসে সামান্যতম ফাটল ধরেনি। নিরাশ হয়নি তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ থেকে। তাদের একীন ছিল আজকের এই কঠিন বিপদ থেকে একমাত্র বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে মুক্তি দিতে পারেন। তাই কালক্ষেপণ না করে সবাই আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করল।

প্রথমে তিন বন্ধু মিলে পরামর্শ করল। তারা বলল, আল্লাহর মেহেরবানী ছাড়া এ বিপদ থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। সুতরাং আমাদের উচিত হবে জীবনের সবচেয়ে উত্তম নেক আমলের উসিলা দিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করতে থাকা। আশা করি, মহান দয়ালু আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করে আমাদের ফরিয়াদ কবুল করবেন এবং গুহামুখ থেকে পাথর সরিয়ে আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবেন।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রথম বন্ধু বলতে লাগল- হে আল্লাহ! আপনি ভাল করেই জানেন যে, আমার মাতা-পিতা বৃদ্ধ ছিলেন, আমি তাদের খেদমত

করতাম। আমার প্রতিদিনের নিয়ম এ ছিল যে, রাতের বেলা তাদেরকে দুধ পান না করিয়ে আমার স্ত্রী-সন্তান, গোলাম বাদী কাউকেই দুধ পান করাতাম না। একবার আমাকে গৃহ পালিত পশুগুলোর খানা দানা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বহুদূর যেতে হল। ফলে যথাসময়ে বাড়ি ফিরা সম্ভব হল না। অনেক রাতে এসে দেখি, পিতা-মাতা উভয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি তাদের জন্য দুধ দোহন করলাম এবং তাদের খেদমতে হাজির হলাম। ঘুমিয়ে ছিলেন বিধায় তাদেরকে জাগ্রত করা আমার কাছে অপছন্দ মনে হল এবং তাদেরকে দুধ পান করানোর পূর্বে পরিবারের অন্য লোকদেরকে পান করাতেও মন চাইল না। আমার বাচ্চাগুলো তখন এতই ক্ষুধার্ত ছিল যে, আমার পায়ের নিকট একটু খাবারের আশায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছিল।

দুধের পেয়ালা আমার হাতেই ছিল। আমি তাদের ঘুম থেকে জেগে উঠার অপেক্ষা করছিলাম। ধীরে ধীরে রাত গভীর হতে চলল। কিন্তু তাতেও আমি কোনরূপ বিচলিত হলাম না। বরং পূর্বের ন্যায় দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। এভাবে আস্তে আস্তে ভোর হয়ে পূর্ব গগন ফর্সা হয়ে উঠল। অতঃপর তারা জাগ্রত হলে আমি দুধের পিয়ালাটি তাদের হাতে তুলে দিলাম। তারা তা পান করে ক্ষুধা নিবারণ করলেন।

হে আল্লাহ! যদি আমি এক কাজটি কেবল আপনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই করে থাকি, তবে গুহার মুখে পাথর পড়ার কারণে যে বিপদে আমরা পড়েছি তা দূর করে দাও।

প্রথম ব্যক্তির দুআ শেষ হওয়ার সাথে সাথে পাথরখানা একটু সরে গেল বটে কিন্তু গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার মত প্রশস্ত পথ তৈরি হল না।

এবার দ্বিতীয় বন্ধুর পালা। সে দু'হাত উপরে উঠিয়ে বড়ই কাকুতি মিনতি করে বলতে লাগল-

হে দয়াময় খোদা! আমার এক চাচাত বোন ছিল। আমি তাকে খুব মহব্বত করতাম। একজন পুরুষ কোন নারীকে যতবেশী মহব্বত করতে পারে আমি তাকে ততবেশী মহব্বত করতাম। একদিন আমি সুযোগ পেয়ে তার কাছে আমার অপবিত্র মনোবাসনা পূর্ণ করার প্রস্তাব দিলাম।

কিন্তু তার অন্তরে ছিল তোমার ভয়। ফলে সে কিছুতেই আমার প্রস্তাবে রাজি হল না। এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। এরই মধ্যে সে খুব অভাবে পড়ল। দুর্ভিক্ষের কারণে সৃষ্ট অভাবে সে এমন ভাবে আক্রান্ত হল যে, সে আমার নিকট সাহায্য চাইতে বাধ্য হল। আমি আবার সুযোগ পেলাম। অবশেষে আমার মনের খাহেশ পূর্ণ করার শর্তে তাকে একশত বিশ দিনার দান করলাম। সে এতই বিপদগ্রস্থ ছিল যে, শেষ পর্যন্ত অপারগ হয়ে আমার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে পারল না। তখন অবস্থা এই ছিল যে, আমি তখন পুরোপুরি শয়তানের জালে আবদ্ধ আর আমার চাচাতো বোনটি আমার পূর্ণ দখলে। শেষ পর্যন্ত আমি যখন স্বীয় ইচ্ছা পূরণে উদ্যত হলাম এমন সময় হঠাৎ সে বলে উঠল। হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর। অবৈধভাবে আমার কৌমার্য নষ্ট করো না। তার এ কথা শুনে আমার মধ্যে ভয়ের উদ্রেক হল। ফলে সঙ্গে সঙ্গে আমি অসৎ ইচ্ছা ত্যাগ করে সেখান থেকে চলে গেলাম। এমনকি তাকে যে দিনারগুলো দিয়েছিলাম তাও ফিরিয়ে নেয়নি। ওগো দয়ালু প্রভূ! যদি এ কাজটি একমাত্র আপনার রাজি খুশির জন্যেই করে থাকি তবে আমাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

তার দুআ শেষে পাথরটি আরেকটু সরে গেল। কিন্তু তাতেও বের হওয়ার মতো পথ সৃষ্টি হল না।

তৃতীয় বন্ধু বলল, হে করুণার আধার! আমি কয়েকজন মজদুর কাজের জন্য রেখেছিলাম। কাজ শেষে প্রত্যেকের মুজুরী আমি পরিশোধ করলাম। কিন্তু একজন তার মুজুরী না নিয়েই চলে গেল। তার রেখে যাওয়া টাকাটা ব্যবসায় খাটালাম। এতে অনেক লাভ হল। ব্যবসার মালামালও বৃদ্ধি পেল প্রচুর পরিমানে এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন ঐ মজদুর এসে বলল, আমার মজুরী দিয়ে দিন। আমি বললাম-

যত উট, গরু, ছাগল, চাকর দেখছ এ সবই তোমার মজুরী। সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার সাথে উপহাস করবেন না। আমি বললাম, উপহাস করছি না, যা বলেছি সত্যিই বলেছি। এরপর তার কাছে বিস্তারিত খুলে বলার পর সে সবকিছু নিয়ে চলে গেল। কিছুই রেখে গেল

না। হে প্রভূ! আমি যদি তোমারই সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তবে আমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও।

তৃতীয় ব্যক্তির ফরিয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে পাথরটি সম্পূর্ণরূপে সরে গেল। ফলে তিনজনই গুহা থেকে বেরিয়ে এসে ঐ কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করল।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! পিতা-মাতার খেদমত, নারীর ইজ্জত রক্ষা ও শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ফলাফল কি দাঁড়াল, তা আমরা আলোচ্য ঘটনা থেকে জানতে পারলাম। তাই আসুন, এখন থেকেই আমরা পিতা মাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করি, তাদের সুখ-দুঃখ ও আশা আকাঙ্খার প্রতি পূর্ণমাত্রায় খেয়াল রাখি। অবলা-অসহায় নারীকে হাতের মুঠোয় পেলেও আপন বোনের মতোই সদাচরণ করি, তার গায়ে হাত দেব দূরের কথা, চোখ তুলে তাকাবার চেষ্টাও না করি। সাথে সাথে অফিস আদালতের নিম্নস্তরের কর্মচারী, কল-কারখানার শ্রমিক ও বাসার চাকর বাকরদের প্রতিও সদয় হই। সব সময় মনে রাখি তারাও আমাদের মতো মানুষ। তাদেরও একটি মন আছে। তাদের মনে কষ্ট দিলে কিংবা হক আদায়ে অবহেলা করলে অবশ্যই আল্লাহর সামনে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

[সূত্র ঃ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২ঃ৪২০]

৭
১৯৯

সত্য কথাই বলে যাব

গ্রীষ্ম কাল। প্রখর রৌদ্র। চারিদিকে প্রচন্ড উত্তাপ। ফসল পাকে পাকে অবস্থা। এরই মধ্যে ডাক পড়ে ঐতিহাসিক তাবুক যুদ্ধের। মদীনা থেকে তাবুকের দূরত্ব প্রায় দু'আড়াইশ মাইল। বর্তমান কালের মত বাস, ট্রেন লঞ্চ কিংবা উড়োজাহাজ তখন ছিল না। উট ঘোড়া বা পায়ে হাঁটাই ছিল তখনকার দিনে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম। সুতরাং গরম কালের এই দীর্ঘ সফর অন্য যে কোন সফর থেকে বেশি কষ্টকর হবে একথা সহজেই অনুমান করা যায়।

হযরত সাহাবায়েকেরাম ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে গড়া ব্যক্তিত্ব। তাঁর সুহবতে তাঁরা হয়ে ছিলেন সোনালী মানুষ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথায় কেবল অর্থ সম্পদ ব্যয় কিংবা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া নয়, হাসি মুখে প্রাণ বিসর্জন দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না তাঁরা।

যুদ্ধের আহবানে সাহাবীদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। অল্প দিনের মধ্যেই সবাই যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। প্রস্তুতি শেষে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিয়ে তাবুক অভিমুখে রওয়ানা দেন। এ যুদ্ধে বেশ কিছু মুনাফিক গরমের বাহানা দিয়ে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। এছাড়া তিনজন খাঁটি মুসলমান কোনরূপ ওজর আপত্তি ছাড়াই উক্ত যুদ্ধে শরিক হননি। তাদের মধ্যে হযরত কাব ইবনে মালেক (রা.) অন্যতম। কেন তারা যুদ্ধে যাননি, না যাওয়ার কারণে খোদার পক্ষ থেকে তাদের ব্যাপারে কী ফায়সালা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত কিভাবে,

কি জন্য তারা লাভ করেছিলেন আল্লাহর অপার করুণা ও ক্ষমার ঘোষণা- নিম্নোক্ত বর্ণনায় তাই আলোচনা করার প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ।

হযরত কা'ব (রা.)-এর অন্য দুই সাথী হলেন হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা.) ও মোরারাহ ইবনে রবিই (রা.)। [কাব (রা.) এর ঘটনা একটু পরে বর্ণনা করা হবে। এর আগে ঘটনার পূর্ণতার জন্য তার দুই সাথীর কিঞ্চিত আলোচনা খুবই প্রয়োজন]

তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে হযরত মোরারাহ (রা.) এর বাগানে খুব বেশি ফসল হয়েছিল। তিনি ধারণা করলেন, আমি চলে গেলে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। তদুপরি সব সময় আমি যুদ্ধে শরিক হয়ে থাকি। এবার না গেলে তেমন কি হবে! এসব কথা চিন্তা করে তিনি যুদ্ধে গমন থেকে বিরত থাকেন।

এ দিকে হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা.) এর পরিবার কোথাও গিয়েছিল। বেশ কিছুকাল পর ঠিক ঐ সময় তারা বাড়ি ফিরল যখন তাবুক যুদ্ধের তৈরি চলছে। হযরত হেলাল (রা.) মনে করলেন, সকল যুদ্ধেই তো শরিক হয়ে থাকি, একবার না হয় নাই গেলাম। একথা ভেবে তিনিও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

প্রিয় পাঠক! মানুষ হিসেবে আমাদের যেমন ভুলচুক হয়ে যায়, তেমনি মাঝে মধ্যে হযরত সাহাবায়ে কেরামেরও একটু এদিক সেদিক হয়ে যেত। কিন্তু লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, এসব ভুলের পর তারা কি করতেন আর আমরা কি করি? আসল কথা হল, যে সব কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সংঘটিত হওয়া আল্লাহ তাআলা সঙ্গত মনে করেননি, হযরত সাহাবায়ে কেরাম থেকে সেসব কাজ প্রকাশ করে কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এসব ঘটনার মাধ্যমে গোটা বিশ্ববাসীকে এ কথাই বলতে চাচ্ছেন যে, হে লোক সকল! শয়তানের ধোকা কিংবা প্রবৃত্তির তাড়নায় তোমরা যদি কোন অন্যায় অপরাধ তথা ভুল করে ফেল তবে তা থেকে মুক্তি লাভ ও আমার ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য ঐ পথই তোমরা অবলম্বন কর যে পথ অবলম্বন করেছিলেন আমার প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ।

যা হোক, এবার আসুন আমরা লক্ষ্য করে দেখি, হযরত মুরারাহ (রা.) ও হযরত হেলাল (রা.) আপন ভুল বুঝতে পেরে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুরারাহ (রা.) যখন বুঝলেন যে, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে তিনি

করতুক ভুল করেছেন এবং বাগান ও বাগানের ফসলই হল ভুলের মূল কারণ, তখনই তিনি সমস্ত বাগান আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলেন।

অনুরূপভাবে হযরত হেলাল (রা.) যখন বুঝলেন যে, পরিবারের লোকদের প্রতি অত্যধিক মহব্বতই সকল অনর্থের মূল, তখনই তিনি তাদের থেকে সব রকম সম্পর্ক ত্যাগ করতে মনস্থ করলেন।

মুহতারাম পাঠক! স্বীয় ভুল শোধরানোর জন্য উক্ত সাহাবীদ্বয় যে ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করেছেন, এর কোন নযীর আমাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে কি? উপরন্তু এ দুই সাহাবীসহ সমস্ত সাহাবীদের ব্যাপারে রয়েছে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তাদের সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তাদেরকে তোমরা সমালোচনার পাত্র বানাইও না। সুতরাং এত কড়া হুশিয়ারী থাকার পরেও সাহাবীদের সমালোচনা করা বৈধ হবে কি? তাই আসুন, মূল ঘটনা শুরু করার আগে এ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেই, কখনোই আমরা হযরত সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করব না। তাদের সমালোচনা ও দোষ ত্রুটি খুঁজে বের করাকে আমরা অবৈধ মনে করব। সেই সাথে তাদের সমালোচনা যারা করে কিংবা করাকে বৈধ ও জায়েজ মনে করে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব এবং দাঁতভাঙ্গা জবাব দেব। এবার চলুন হযরত কা'ব (রা.) এর ঘটনা তার নিজের মুখ থেকেই শুনি এবং এ থেকে শিক্ষা নিয়ে আজীবন সত্য কথা বলার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করি।

হযরত কাব (রা.) বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় আমি যতখানি স্বচ্ছল ও সুখি ছিলাম ইতোপূর্বে কখনোই ততটুকু ছিলাম না। তখন আমার নিজস্ব দুটি উট ছিল। ছিল শক্তি ও সম্পদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল যুদ্ধে যাওয়ার সময় যুদ্ধস্থান উল্লেখ না করা। কিন্তু এ যুদ্ধের ব্যাপারটি তিনি গোপন রাখলেন না। ভীষণ গরম, দূরের সফর, শত্রু সৈন্য অগণিত ইত্যাদি কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কিছু খুলে বলে দিলেন, যেন সবাই পরিপূর্ণ রূপে প্রস্তুতি নিতে পারে।

যুদ্ধের ঘোষণার পর দলে দলে লোকজন এত বেশি আসতে লাগল যাদের সকলের নাম তালিকাভুক্ত করাও সম্ভব ছিল না। ফলে কেউ গা ঢাকা দিয়ে পিছনে থেকে গেলে সহজে ধরা না পড়াটাই স্বাভাবিক হয়ে গেল।

যুদ্ধের প্রস্তুতি চলার সময় প্রত্যহ সকালে সবাই একত্রে জমা হত। আমিও প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে যেতাম বটে, কিন্তু কোন কিছু না করেই ফিরে আসতাম। মনে মনে ভাবতাম যে, এত তাড়া কিসের? আমি তো ইচ্ছে করলেই প্রস্তুতি নিয়ে নিতে পারি। এভাবে গড়িমসি করতে করতে অনেকদিন চলে গেল। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদ সাহাবীদের নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। কিন্তু তখনো আমার প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি। আমি আবার প্রস্তুতি নিতে গেলাম কিন্তু কিছুই করলাম না। মনে মনে ভাবলাম, একটি দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে শীঘ্রই তাদের সাথে মিলে যাব। আহা! আমি যদি তা করতাম। মোটকথা, শেষ পর্যন্ত আমার ভাগ্যে এ জিহাদে আর যাওয়া হল না।

তাবুক পৌঁছা পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা স্মরণ করেন নি। সেখানে যাওয়ার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কা'বের কি হল? তাকে দেখছি না যে! উত্তরে বনী সালেমার একজন বলল, কা'বের ধন সম্পদ ও সুন্দর স্বাস্থ্যই তাকে আটকে রেখেছে।

লোকটির কথা হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) এর নিকট ভাল লাগল না। তিনি প্রতি উত্তরে বললেন, হে আল্লাহ রাসূল ! খোদার শপথ করে বলছি, আমরা কা'বের ব্যাপারে ভাল ছাড়া খারাপ কিছু জানি না। তাদের কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মন্তব্য করলেন না। চুপ হয়ে বসে রইলেন।

হযরত কাব (রা.) বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফিরে আসার সংবাদ পেলাম তখন চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন রকম চিন্তা এসে আমাকে ঘিরে ধরল। আমি পরিবারের সকল জ্ঞানী ব্যক্তিদের পরামর্শ নিলাম। বাঁচার জন্য মিথ্যা অজুহাত খাড়া করা সমীচীন হবে কিনা সে কথাও মাথায় এলো। কিন্তু যখন শুনলাম, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসেই গেছেন তখন মনের মধ্যে এ কথার বিশ্বাসই বদ্ধমূল করে নিলাম যে, সত্য ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় মুক্তি নেই। অতএব আমাকে সত্যই বলতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বরকতময় অভ্যাসসমূহ থেকে একটি অভ্যাস এও ছিল যে, সফর থেকে ফিরে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়তেন। তারপর সাহাবীদের সাথে কিছুক্ষণ

আলাপ করে বাসায় যেতেন। এ নিয়ম অনুযায়ী তিনি যখন নামাজ শেষে লোকদের মুখোমুখি হয়ে বসলেন তখন মুনাফিকরা খোড়া অজুহাত দেখিয়ে মিথ্যা কসম খেতে লাগল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ওজর বাহ্যিক দৃষ্টিতে কবুল করে অন্তরের অবস্থা আল্লাহর উপর সোপর্দ করতে লাগলেন।

ইত্যবসরে আমি এসে হাজির হলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্টির ভঙ্গিতে মুচকি হাসলেন। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! কসম খোদার, আমি মোনাফেকও নই, ঈমানের ব্যাপারে সন্দিহানও নই। অতঃপর তিনি আমাকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, যুদ্ধের জন্য তুমি দুটি উট খরিদ করেছিলে, তবু কেন যুদ্ধে শরিক হওনি?

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি দুনিয়াদার কোন লোকের নিকট বসতাম তাহলে যক্তিযুক্ত মিথ্যা কারণ দেখিয়ে তার ক্রোধ থেকে রক্ষা পেতাম। আর যুক্তি প্রদর্শনের যোগ্যতাও আমার আছে। কিন্তু একথা আমার ভাল করেই জানা আছে যে, এখন যদি মিথ্যা বলে আপনাকে রাজি করে নেই, তবে অচিরেই আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে আপনাকে তা জানিয়ে দিবেন। ফলে আপনি আমার উপর নাখোশ হয়ে যাবেন। আর যদি সত্য কথা বলি তবে আপনি আমার উপর আপাতত অসন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ পাক আপনার অসন্তুষ্টিকে দূর করে দিবেন।

তাই আমি সত্য কথাই বলছি যে, আল্লাহর শপথ আমার কোন ওজর ছিল না। আর্থিক দিক দিয়েও আমি অন্য সময়ের চেয়ে বেশি স্বচ্ছল ছিলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সত্যই বলেছ। এখন চলে যাও। তোমার ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা করছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবার থেকে উঠে আসার পর বনী সালেমার কয়েকজন লোক আমাকে বলল, অন্য সময় যেহেতু তুমি কোন অন্যায় কাজ করনি, সেহেতু কোন ওজর আপত্তি দেখিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ক্ষমা চাইলেই তো তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দিতেন।

তাদের এ কথার জবাবে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে আমি প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বললাম, আমার মত এরূপ ব্যাপার আর কারো ঘটেছে কি?

তারা বলল, হ্যাঁ, আরও দু'জনের এমন ঘটনা ঘটেছে। তুমি যা বলেছ তারাও তেমনি বলেছে। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকেও তাই বলেছেন যা তোমাকে বলেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কে কে? তারা বলল, একজন হেলাল ইবনে উমাইয়া ও অপরজন মুরারাহ ইবনে রবী (রা.)

হযরত কা'ব (রা.) বলেন, লোকেরা আমার নিকট যে দু'জন লোকের নাম বলল, তারা ছিলেন খুবই সৎ ও আদর্শ পুরুষ। বদরের যুদ্ধেও তারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তিনজনের সাথে সমস্ত লোকের কথাবার্তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। ফলে সবাই আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে লাগল এবং কথাবার্তাও বন্ধ করে দিল। মনে হল, গোটা পৃথিবী যেন বদলে গেছে। সংকীর্ণ হয়ে এসেছে এর পরিধি। পরিচিত দেশ, পরিচিত জন, পথ ঘাট সবই যেন অপরিচিত হয়ে গেল।

এ সময় আমি এ কথা ভেবে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলাম এখন যদি আমার মৃত্যু হয় তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জানাযার নামাজও পড়াবেন না। আর যদি আল্লাহ না করুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে ইন্তেকাল করেন, তবে এ অবস্থায়ই আমি থেকে যাব। কেউ আমার জানাযাও পড়বে না। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের খেলাফ কে করতে পারে?

আমার অপর দুই সাথী প্রথম থেকেই বার্ধ্যক্য জনিত কারণে ঘরে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন এবং বসে বসে কাঁদতে লাগলেন। আমি শক্তিশালী নওজোয়ান ছিলাম। মসজিদে যেতাম। জামাতের সাথে নামাজ পড়তাম। বাজারে চলাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথাবার্তা বলত না।

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তাম। মনে হত, আমি যখন নামাজ পড়ি তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আর যখন ওদিকে লক্ষ্য করি, তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে গিয়ে সালাম দিতাম। খুব খিয়াল রাখতাম, আমার সালামের উত্তরে তাঁর মোবারক ঠোঁট নড়ে কিনা? এভাবেই মুসলিম সমাজের বিচ্ছিন্নতা ও উপেক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের সংকটময় দিনগুলো অতিবাহিত হচ্ছিল।

www.smfoundationbd.com

একদিন আমার চাচাত ভাই আবু কাতাদার দেয়াল টপকে তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু সে জবাব দিল না। আমি তাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু কাতাদাহ! তুমি কি জান না যে, আমি আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসি। সে এবারও চুপ রইল। আমি আবারো তাকে কসম দিয়ে এ কথা জিজ্ঞেস করলাম। এবার উত্তরে সে শুধু এতটুক বলল, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। একথা শুনে আমার দু'গন্ড বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। অবশেষে নিজেকে সামলাতে না পেরে সেখান থেকে চলে এলাম।

আরেক দিনের ঘটনা। একদা আমি মদীনার বাজারে ঘোরাফেরা করছিলাম। এমন সময় সিরিয়া থেকে আগত এক কৃষক আমাকে খুঁজতে লাগল। লোকেরা ইশারায় আমাকে দেখিয়ে দিল। সে আমার নিকট এসে গাসসান বাদশাহের একখানা পত্র দিল। তাতে লেখা ছিল-

আমি শুনতে পারলাম, তোমার মনিব (মুহাম্মদ) নাকি তোমার উপর যথেষ্ট অত্যাচার করেছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে সেই অপমানজনক স্থানে যেন না রাখেন এবং অপদস্ত না করেন। তুমি আমার নিকট চলে এসো। তোমাকে উপযুক্ত সাহায্য-সহযোগিতা করব।

পত্র পাঠ শেষে আমি ইন্নালিল্লাহি পড়লাম এবং ভাবলাম, আমি এতই নিম্নস্তরে পৌঁছে গিয়েছি যে, বেদ্বীন কাফেররা পর্যন্ত আমার ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করেছে। এরূপ হওয়াকে আমি বিরাট এক মুসীবত মনে করে চিঠি খানা একটি জ্বলন্ত চুলোয় নিক্ষেপ করলাম।

আমি চরম হতাশায় ভুগছিলাম। এভাবে এক দুই করে চল্লিশটি দিন অতিবাহিত হল। এর মধ্যে আমাদের ব্যাপারে কোন ওহী নাজিল হল না। হঠাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক সংবাদদাতা আমাকে এসে জানাল, তোমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি বললাম, আমি কি তাকে তালাক দেব? সংবাদদাতা বলল- না, তালাক দিতে হবে না, শুধু পৃথক থাকলেই চলবে। এ বলে সে চলে গেল।

লোকটি চলে যাওয়ার পর আমি স্ত্রীকে ডেকে বললাম, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও। যতদিন আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা না করেন ততদিন তোমাকে সেখানেই থাকতে হবে। আমার অপর দুই

সঙ্গীর নিকটও অনুরূপ পয়গাম পাঠানো হল। তবে হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী খুব বুড়ো মানুষ। তার কোন খাদেম নেই। আপনি অনুমতি দিলে আমি তার খেদমত করতে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা করতে পার তবে তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না। হেলালের স্ত্রী বললেন, ঐসবের প্রতি তার কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। এ ঘটনার পর থেকে দিবারাত্রি তিনি কেবল কেঁদে কেঁদে কাটাচ্ছেন।

হযরত কা'ব (রা.) বলেন, হেলালের ঘটনা শুনে আমার পরিবারের কেউ আমাকে বলল, তুমিও তো হেলালের মত স্ত্রীর খেদমতের ব্যাপারে অনুমতি নিতে পার। আমি বললাম, সে বৃদ্ধ আর আমি যুবক। এজন্য অনুমতি নেওয়ার সাহস হয় না। যা হোক এভাবে আরও দশ দিন সহ মোট পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। একদিন আমি ঘরের ছাদে ফজরের নামাজ আদায় করে চিন্তা যুক্ত অবস্থায় বসে আছি। মনে হচ্ছে, পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও চারিদিক থেকে ঘিরে আমার জন্য তা খুবই সংকীর্ণ হয়ে গেছে। হঠাৎ এমন সময় সালআ পাহাড়ের উপর থেকে একজন লোককে চিৎকার করতে শুনলাম। তিনি উচ্চঃস্বরে বলছিলেন- হে কা'ব! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি একথা শুনে সিজদায় পড়ে খুশিতে কাঁদতে লাগলাম এবং বুঝতে পারলাম, বিপদ কেটে গেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের পরেই আমাদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করে দেন। এটা শুনেই এক ব্যক্তি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চিৎকার করে আওয়াজ দিলেন যেন আমি শুনতে পাই। অপর ব্যক্তি ঘোড়ায় আরোহণ করে খুব দ্রুতবেগে এসে আমাকে খবর দেন। এ খবর শুনে আমি এতটাই খুশি হয়েছিলাম যে, সঙ্গে সঙ্গে পরণের দুখানা কাপড় তাকে দান করে দেই। অথচ খোদার কসম, ঐ দু'খানা কাপড় ব্যতীত অন্য কোন কাপড়ের মালিক তখন আমি ছিলাম না। তারপর দু'খানা কাপড় ধার করে পরিধান করি ও হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হই। আমার সাথীদ্বয়ের নিকটও সুসংবাদ নিয়ে লোকজন গিয়ে ছিল। আমি যখন মসজিদে নববীতে হাজির হই তখন উপস্থিত লোকজন দৌড়ে এসে আমাকে ধন্যবাদ দেয় ও মোসাফাহা করে। তম্মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন হযরত আবু তালহা (রা.)। তাঁর এ প্রাণঢালা অভিনন্দনের কথা চিরকাল আমার মনে থাকবে।

হযরত কা'ব (রা.) বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হয়ে তাকে সালাম দিলাম তখন তার চেহারা খুশিতে ঝলমল করছিল। তিনি বললেন, হে কা'ব! তোমার জন্ম দিন থেকে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে উত্তম সুসংবাদটুকু গ্রহণ কর।

আমি জিজ্ঞেস করলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, না বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আনন্দিত হতেন, তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যেত এবং মনে হত যেন এক টুকরো চাঁদ।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে বসে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তওবার পূর্ণতার জন্য আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলাম। কারণ এ সম্পত্তিই আমার মসিবতের কারণ।

দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, সবটুকু দান করলে কষ্ট হতে পারে, কাজেই নিজের জন্য কিছু রেখে দাও। আমি বললাম, তাহলে খায়বারের অংশটুকু রেখে দেই।

আমি আরও বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ পাক আমাকে সত্য কথা বলার জন্য মুক্তি দিয়েছেন। কাজেই আমার তওবার দাবি এও যে, আমি বাকি জীবন সত্য কথাই বলে যাব। খোদার শপথ ঐ সময় থেকে আজ পর্যন্ত মিথ্যা বলব দূরের কথা, মিথ্যা বলার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত করি নি। বাকি জীবনেও আল্লাহ তা'আলা আমাকে মিথ্যা বলা থেকে হেফাজত করবেন বলে আশা রাখি।

সম্মানিত পাঠক! আসুন, হযরত কা'ব (রা.) এর কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলি, মৃত্যু পর্যন্ত কখনো মিথ্যা বলব না, এমনকি মিথ্যার ধারে কাছেও যাব না। হে রহমতের আধার! তুমি আমাদেরকে সত্যের উপর অটল ও অবিচল থাকার তাওফীক দাও এবং মিথ্যা থেকে হেফাজত কর। আমীন।

[সূত্র ঃ বুখারী, মুসলিম। সহায়তায় ঃ হেকায়েতে সাহাবা ঃ ৫৭৩]

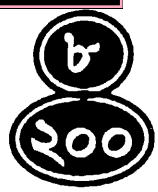

মায়ের অবাধ্য হয়ে হজে যাওয়ার পরিণতি

সে বহুদিন পূর্বের কথা। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না। ইচ্ছা করলেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া যেত না। বরং বহু সময় ও কষ্টের পরেই তা সম্ভব হত। আজকে যেমন জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দার থেকে মাত্র ছয় ঘন্টার ব্যবধানে জেদ্দা বিমান বন্দরে পৌঁছা যায় তখন কিন্তু তা কল্পনাও করা যেত না। আমি এখন সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের ঐ সময়কার একটি চমকপ্রদ শিক্ষণীয় ঘটনা শুনাব, যখন আধুনিক কালের উন্নত যানবাহনগুলোর অস্তিত্ব ছিল না।

আশি পঁচাশি বছরের এক অশীতিপর বৃদ্ধা। তার এক ছেলে দুই মেয়ে। মেয়ে দুটির বিবাহ অনেক আগেই হয়ে গেছে। মেয়েরা তাদের স্বামীর সংসারে সুখেই দিনাতিপাত করছে।

ছেলেটির নাম আব্দুল্লাহ। মাদরাসায় কয়েক ক্লাস লেখা-পড়া করেছে। এলাকার লোকেরা তাকে মৌলভী আব্দুল্লাহ বলে ডাকে। ছেলেটি বেশ শান্ত স্বভাবের। কারো সাথে ঝগড়া করে না, মারামারি করে না। মাকে এখন সেই দেখাশুনা করে।

আব্দুল্লাহর মনে ছিল হজ করার এক তীব্র বাসনা। এ বাসনা একদিন দুদিনের নয়। বহুকাল আগের, বহু পু'রানো এ বাসনা। কা'বা শরীফ তাওয়াফ এবং মদীনায় রওজায়ে আতহারের পাশে দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পেশ করা তার জীবনের এক বিরাট স্বপ্ন ছিল। এ স্বপ্ন পূরণে কোন বাধাও তার ছিল না। সুস্থ দেহ, আর্থিক স্বচ্ছলতা সবই তার ছিল। কিন্তু একমাত্র মায়ের জন্য তার এ স্বপ্ন পূরণ বিলম্বিত হচ্ছিল।

আব্দুল্লাহ মায়ের সেবা করে। মাও তাকে ভীষণ ভালবাসে। মা যেন এ ছেলেকে ছাড়া কিছুই বুঝে না। প্রতিবছর হজের সময় এলে আব্দুল্লাহ মায়ের কাছে যায়। মিনতির স্বরে বলে-

মা! আমি এ বছর হজে যেতে চাই। আপনার অনুমতি হলেই রওয়ানা দিতে পারি।

সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসা এমনিতেই সীমাহীন। তদুপরি আব্দুল্লাহ তার একমাত্র ছেলে। বয়সও অনেক হয়ে গেছে। অনেক কাজ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিজে নিজে করতে পারেন না। অন্যের সাহায্য নিতে হয়। তাই ছেলে হজের অনুমতি চাইলে বরাবরই তিনি একই কথা বলে ছেলেকে ফিরিয়ে দেন। বলেন-

বাবা! আমি অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে গেছি। তুমি ব্যতীত আমাকে দেখাশুনা করার আর কেউ নেই। তুমি আসার পূর্বেই হয়ত মরে যাব। সুতরাং এ বছর হজে যাওয়া স্থগিত রাখ।

এভাবে চার পাঁচ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ছেলের ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেল। সে এবার দৃঢ় সংকল্প করল যে, এ বছর যেভাবেই হউক হজে যাব। মায়ের কথা কিছুতেই মানব না। এবার তিনি অনুমতি দিক বা না দিক তাতে আমার কোন পরওয়া নেই। যেভাবে পারি, আমি আমার সংকল্প বাস্তবায়ন করবই।

দেখতে দেখতে হজের সময় ঘনিয়ে এল। আব্দুল্লাহ হজের পূর্ণ প্রস্তুতি নিল। কিন্তু একথা মাকে জানাল না। অবশেষে রওয়ানা হওয়ার দিন মাকে বলল-

ঃ মা দুআ করো। আজকেই হজের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছি।

ঃ আজই বের হচ্ছ অথচ আগে আমাকে কিছুই জানাও নি! মায়ের কণ্ঠ চিরে একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়ে।

ঃ হ্যাঁ, এবার আপনাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করি নি।

ঃ কেন?

ঃ অতীতের বছরগুলোতে আপনার অনুমতি চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি

দেন নি। আমার বিশ্বাস এ বছরও আপনি তাই বলবেন। সে জন্য আপনার অনুমতি না নিয়েই এবার হজে যাওয়ার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি।

ঃ বাবা! তুমি এ বছরও যেয়ো না। তোমার কাছে এ আমার শেষ আবদার। আর কখনো তোমাকে নিষেধ করব না।

ঃ আমি আপনার কথা মানব না মা। আপনার নিকট এখন আমি অনুমতি নিতেও আসিনি। হজে যাচ্ছি শুধু এতটুকু জানানোর জন্য এসেছি।

ঃ বাবা! তুমি কি আমার শেষ আবেদনটুকুও রাখবে না?

ঃ না, রাখব না। রাখতে পারি না। কারণ আপনি কেবল প্রতি বছর একই অজুহাত দিয়ে থাকেন। বলেন যে, তুমি হজ থেকে ফিরে আসার আগেই মৃত্যুবরণ করব, তাই তুমি এ বছর যেয়ো না। অথচ আপনি আজ পর্যন্ত মরেন নি।

ঃ তুমি ছেলে হয়ে কথাটি এভাবে বলতে পারলে?

ঃ হ্যাঁ, না বলে কোন উপায় দেখছি না, মা। আমি এ বৎসর অবশ্যই হজে যাব, চাই আপনি মরে যান বা জীবিত থাকেন।

একথা বলে আব্দুল্লাহ বগলে একখানা কিতাব রেখে মক্কার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন। এ সময় বৃদ্ধা জননী অনেক অনুনয় বিনয় করে আবারো বলছিলেন, বাবা! তুমি যেয়ো না। আমার মন বলছে এ বছরই আমি মারা যাব। আমাকে একাকী রেখে যেয়ো না। তুমি চলে গেলে কে আমার খেদমত করবে? কে আমাকে দেখাশুনা করবে? আমার তো আপনজন বলতে দুনিয়াতে আর কেউ নেই। তোমার বোনেরাও তো জামাইয়ের বাড়িতে চলে গেছে।

হৃদয়ের গহীন কোণ থেকে উৎসারিত মায়ের এ কথাগুলোর দিকে আব্দুল্লাহ বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করল না। ফিরে এসে মাকে দু'খানা সান্ত্বনার কথাও শুনাল না। এমনকি ফিরেও তাকাল না। সোজা বের হয়ে হজের পথ ধরল।

ছেলের এ আচরণে মায়ের মনে বেশ কষ্ট লাগল। তার হৃদয়টা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ল চোখের দু'কোণ বেয়ে। তিনি নিজেকে সামলাতে পারলেন না। ধপাস করে মাটিতে বসে পড়লেন। তারপর হাত দুটো উপরে তুলে বললেন-

হে পরওয়ার দেগার আল্লাহ! তুমি আব্দুল্লাহর কাণ্ড দেখেছ। সে আমার কথা শুনল না। আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। ওগো পরাক্রমশালী মাওলা! তুমিও তার কথা শুনিও না এবং তার দিক থেকে তোমার রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও। সে যেমন আমাকে কষ্ট দিল তেমনি তুমিও তাকে কষ্টের মধ্যে ফেলিও।

এদিকে মৌলভী আব্দুল্লাহ বিরামহীন গতিতে এগিয়ে চলছে। তার মনে আশা পূর্ণ হওয়ার এক বুক স্বপ্ন। কোন দিকে খেয়াল নেই তার। চলছে তো চলছেই।

অনেক দূরের সফর। একটানা কতদূর আর চলা যায়। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে গেলে আব্দুল্লাহ গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। কখনো বা চলে যায় নিকটবর্তী কোন মসজিদে। মুসাফিরখানার সন্ধান না পেলে মসজিদেই রাতটা কাটিয়ে দেয়। সেখানে বিশ্রামের পাশাপাশি ইবাদত করারও বেশ মওকা মিলে যায়।

একদিনের ঘটনা

রাত্রি যাপনের জন্য আব্দুল্লাহ একটি মসজিদে অবস্থান নেয়। ইশার নামাজ আদায় ও খাওয়া দাওয়া শেষে সে ঘুমিয়ে পড়ে। মসজিদটি ছিল লোকালয় থেকে একটু দূরে। সফরের ক্লান্তির কারণে অল্প সময়ের মধ্যে সে নিজেকে সঁপে দেয় গভীর নিদ্রার কোলে।

রাত তখন তিনটা। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাত মেললে হাত দেখা যায় না। আব্দুল্লাহ ঘুম থেকে জেগে উঠে। ভাল করে অজু করে। তারপর তাহাজ্জুদে দাঁড়ায়। নীরব, নিস্তব্ধ নির্জন পরিবেশে বড়ই একাগ্রতার সাথে নামাজ পড়তে থাকে। মসজিদের দরজা তখন খোলাই ছিল।

ঘটনাক্রমে মসজিদের পাশের বাড়িতে এক চোর ঢুকে। সে মালামাল নিয়ে পালানোর সময় লোকজন টের পেয়ে যায়। সবাই তার পিছে পিছে ধাওয়া করে। চোর বেচারা উপায়ান্তর না দেখে মসজিদে ঢুকে পড়ে। সে দেখে এক ব্যক্তি নামাজে মগ্ন।

এমন সময় চোরের মাথায় এক বুদ্ধি আসে। সে ভাবে, যদি মালগুলো লোকটির কাছাকাছি রেখে পালাতে পারি, তবে লোকজন আমার পিছনে আর দৌড়াবে না। তাকেই চোর মনে করে শাস্তি দিবে।

সময় খুব কম। বেশি চিন্তা করার সময় নেই। চোর বেচারা তড়িগড়ি করে চোরাইকৃত মালামালগুলো নামাজি ব্যক্তির কাছে নিয়ে আস্তে করে রেখে দেয়। অতঃপর দেয়াল টপকে অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

চোর তো জান নিয়ে পালাল কিন্তু বিপদ চাপল মৌলভী সাহেবের ঘাড়ে। লোকজন যখন দেখল, চোর মহাশয় মসজিদে ঢুকেছে তখন দেরী না করে চতুর্দিক থেকে তারা মসজিদ ঘিরে নেয়। কিন্তু ততক্ষণে প্রকৃত চোর পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এক পর্যায়ে কয়েকজন সাহসী লোক ভিতরে প্রবেশ করে। দেখে, এক ব্যক্তি নামাজ পড়ছে। তার পরণে লম্বা আলখেল্লা। পিছনে রয়েছে চোরাই মাল।

লোকজন বিস্মিত হয়। কারণ এমন চোর জীবনেও তারা দেখে নি। তারা পরস্পর বলাবলি করে- আশ্চর্য চোর তো! জান বাঁচানোর জন্য চুরির মালপত্র মসজিদে রেখে নামাজ শুরু করে দিয়েছে।

এ দৃশ্য দেখে এলাকার লোকেরা ক্রোধে ফেটে পড়ে। একে তো চোর, তার উপর আবার ভণ্ডামী, এ কি সহ্য করা যায়? তারা তাদের ধারণায় মৌলভী বেশী চোরকে টেনে হেচড়ে বাইরে নিয়ে আসে। তারপর শুরু হয় উত্তম মাধ্যম। আচ্ছামত ধোলাই। যে যেভাবে পারে পেটাতে থাকে। লাথি-ঘুষি, কিল-গুতো কোন কিছুই বাদ পরে নি। এলাকার ছেলেরাও সুযোগ পেয়ে দুচার ঘা লাগাতে কসুর করে না। মোটকথা, বাকি রাতটুকু মৌলভী সাহেবের গণ পিটুনী খেয়েই শেষ হয়।

পরদিন বাদ ফজর। লোকেরা তাকে নিয়ে বিচারকের দরবারে

উপস্থিত হয়। তারা বলে-

মাননীয় বিচারপতি! এ এক আশ্চর্য ধরনের চোর। এর দ্বিগুণ শাস্তি হওয়া উচিত। কারণ একদিকে সে সুন্নতি পোষাক পড়ে সুন্নতের অবমাননা করেছে, তেমনি অন্য দিকে মসজিদে গিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে মানুষকে প্রতারিত করতে চেয়েছে।

বিচারক সবকিছু শুনে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে উপস্থিত জনতাকে ফয়সালা শুনালেন। বললেন-

চুরির শাস্তি হিসেবে এর হাত কাটা হবে, চোরাই মাল মসজিদে রাখার জন্য এর পা কাটা হবে এবং মৌলভী বেশ ধারণ করে এই জঘন্য কর্ম করার জন্য তার দুই চক্ষু উপড়ে ফেলা হবে। শুধু তাই নয়। শাস্তি কার্যকর করার পূর্বে তাকে গোটা এলাকায় ঘুরিয়ে আনতে হবে। তার সাথে একজন ঘোষণাকারী থাকবে। সে উচ্চস্বরে বলবে "মৌলভীর বেশ ধরে যে এ কাজ করবে তার শাস্তি এই।"

বিচারকের কথা অনুযায়ী লোকজন তাকে এলাকায় নিয়ে গেল। চতুর্দিক থেকে তিরস্কার ও বিদ্রুপ করতে লাগল। ঘোষণাকারী ঘোষণা করল- যে ব্যক্তি মৌলভীর বেশে চুরি করে এবং চুরির মাল মসজিদে রেখে নামাজ পড়ে তার শাস্তি এই।

এতক্ষণ এলাকাবাসীদের অকথ্য নির্যাতন নীরবে সহ্য করে যাচ্ছিল মৌলভী আব্দুল্লাহ। সে একটি টু শব্দও করছিল না। কিন্তু যখন ঘোষণাকারী বিচারকের শিখানো কথাগুলো উচ্চারণ করল তখন সে বলল-

ভাই! ঐ কথা না বলে বরং বল- যে ব্যক্তি মায়ের কথা না মেনে হজে যাওয়ার আশা করে তার এই শাস্তি হয়।

ঘোষক মৌলভীর কথা বুঝতে পারে না। সে বলে- এই চোর বেটা! একথা দ্বারা তুই কি বুঝাতে চাচ্ছিস?

মৌলভী বলল, কিছুই না। আমি যেভাবে বলেছি সেভাবেই ঘোষণা করুন।

এবার লোকজন পীড়াপীড়ি শুরু করল। তারা বলল, একথা দ্বারা তুমি

কি বুঝাতে চাও? তা এক্ষুণি পরিস্কার করে খুলে বল। নইলে এখনই তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব।

লোকদের চাপাচাপিতে আব্দুল্লাহ সবকিছু বর্ণনা করল। একটি কথাও সে বাদ দিল না। এতে লোকজন তাদের ভুল বুঝতে পারল। গভীরভাবে অনুশোচনা করল। তারপর বিচারকের কাছে ফিরিয়ে এনে পুরো ঘটনা খুলে বলল।

সব শুনে বিচারকও গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং সবার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। মৌলভী আব্দুল্লাহ বলল, না ভাই আপনাদের কোন অন্যায় হয়নি। অন্যায় আমারই হয়েছে। মায়ের অবাধ্যতার কারণেই আমাকে এ ভোগান্তি সহ্য করতে হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! দেখলেন তো, মায়ের কথা না শুনার কারণে একজন ভাল মানুষও কতটা লাঞ্ছনা বঞ্চনা ও অপমানের সম্মুখীন হলেন। আর হবেই না কেন? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেই গেছেন, পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া যায়, আর আখেরাতে তো আছেই । (হাকেম)

[সূত্র ঃ মা কি শফকত ফরামুশ না হো, হুকুকুল ওয়ালিদাইন। সহযোগিতায় ঃ মাতাপিতার খেদমত ও সন্তান প্রতিপালন, মুফতি আমজাদ শাহ কাসেমী।]

যে পাতায় যা আছে

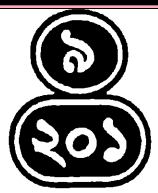

বিশ্বস্ত ক্রীতদাস

প্রভাবশালী এক নেতা। সার্ভ এলাকায় তার বাস। নূহ ইবনে মারইয়াম নামে প্রসিদ্ধ। সেখানকার সম্মান জনক বিচারকের আসনটি তিনিই অলংকৃত করে আছেন।

• বিচারককে আরবীতে কাজী বলা হয়। আজ বহু বছর যাবত নুহ ইবনে মারইয়াম এ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এলাকার লোকেরা বিভিন্ন সমস্যায় নিপতিত হন। কখনো বা শিকার হন জুলুম নির্যাতন ও অত্যাচার অবিচারের। অতঃপর ন্যায়বিচারের জন্য ছুটে আসেন কাজীর দরবারে। কাজী সাহেব বাদী বিবাদীর কথা শুনেন। প্রয়োজনে সাক্ষী-প্রমাণ তলব করেন। অতঃপর ইনসাফ অনুযায়ী ফায়সালা দিয়ে সবাইকে বিদায় দেন।

কাজী সাহেবের ছিল এক রূপসী মেয়ে। মেয়েটি যেমনি সুন্দরী তেমনি বুদ্ধিমতি। তার মনোহারিণী রূপ ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা মানুষের মুখে মুখে ছিল। এ অবস্থা কেবল নিজ অঞ্চলেই নয়, আশে পাশের এলাকাগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল বিদ্যুতের মত।

মেয়েটি বড় হয়েছে। সে এখন পূর্ণ যুবতী। বড় বড় পন্ডিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে অসংখ্য পয়গাম এসেছে। সবাই তাকে বিয়ে করে জীবন সঙ্গিনী বানাতে চায়। চায় দাম্পত্য জীবনের পূর্ণ সুখ লাভ করতে।

www.smfoundationbd.com

কিন্তু কাজী সাহেব কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। পারেন না কিছুই স্থির করতে। তিনি দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। ভাবেন, আমার কলিজার টুকরো মেয়েটিকে কার হাতে তুলে দেব? যদি অমুকের কাছে পাত্রস্থ করি তবে অমুক অসন্তুষ্ট হবে। আবার ওর কাছে দিলে ও নাখোশ হবে। কেউ তো কারো চেয়ে কম নয়। যাহোক অনেক ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কাজী সাহেব ধনাঢ্য ব্যক্তি। অর্থ সম্পদের কোন অভাব নেই। প্রচুর জমিজমা আছে। আছে আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলমূলের একটি বাগানও। মুবারক নামে এক বিশ্বস্ত ক্রীতদাস বাগানটি দেখাশুনা করে।

মুবারক ক্রীতদাস হলে কি হবে? তার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল খোদার ভয়। তাকওয়া পরহেজগারীতে সে ছিল অতুলনীয়। জেনে শুনে কারো হক নষ্ট করার মানুষ সে ছিল না। আজ এক মাস হল, সে কাজী সাহেবের বাগানে কাজ নিয়েছে। কাজী সাহেব চেহারা দেখেই বুঝে ছিলেন ছেলেটি সৎ ও বুদ্ধিমান হবে। বাস্তবতাও ছিল তাই।

একদিনের ঘটনা।

কাজী নূহ আঙ্গুর গাছ দেখার জন্য বাগানে গেলেন। মুবারককে কাছে ডাকলেন। বললেন, মুবারক! আমার জন্য ছোট্ট একটি ঝুড়িতে করে সামান্য আঙ্গুর আন তো।

মুবারক চলে গেল। একটু পর আঙ্গুর নিয়ে ফিরে এল। ধুয়ে পরিস্কার করল। তারপর কাজী সাহেবের সামনে খাওয়ার জন্য পরিবেশন করল।

কাজী সাহেব কয়েকটি আঙ্গুর হাতে নিলেন। একটি মুখে দিলেন। কিন্তু একি! আঙ্গুর মুখে দেওয়ার সাথে সাথে তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। গোটা মুখে ফুটে উঠল প্রচন্ড বিরক্তির ছাপ।

বাগানে ছিল অসংখ্য আঙ্গুর গাছ। কোনটা মিষ্টি কোনটা টক। কিন্তু মুবারক আজও তা পার্থক্য করতে পারেনি। পারেনি মিষ্টি আঙ্গুরের গাছগুলোকে টক আঙ্গুরের গাছ থেকে আলাদা করতে। আর পারবেই বা কেমন করে? সে তো আজ পর্যন্ত একটি আঙ্গুরও মুখে দেয়নি।

টক আঙ্গুর নিয়ে আসায় কাজী সাহেব রাগে কটমট করতে থাকেন। তিনি ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলেন- মুবারক! তোমাকে আমি বুদ্ধিমান মনে

করেছিলাম। কিন্তু আজ দেখছি, তুমিই হলে সবচেয়ে বড় নির্বোধ। যে ক্রীতদাস আপন মনিবের জন্য মিষ্টি আঙ্গুরের পরিবর্তে টক আঙ্গুর নিয়ে আসে, তার চেয়ে বড় বোকা পৃথিবীতে আর আছে কি?

মুবারক মনিবের কথাগুলো মাথা নীচু করে শুনল। মনিব কথা শেষ করলে সে বিনীত কণ্ঠে বলল-

ঃ সম্মানিত মনিব আমার! আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে কোনগুলো মিষ্টি আর কোনগুলো টক তা তো আমি জানি না।

ঃ কি বললে তুমি জানো না! কাজী সাহেব সবিস্ময়ে কথাটি বললেন।

ঃ হ্যাঁ, আমি জানি না।

ঃ দীর্ঘ এক মাস হল, বাগানে কাজ নিয়েছ। আর আজ বলছ এই কথা?

ঃ এক মাস কেন? কয়েক যুগ এমনকি আজীবন থাকলেও আমাকে একই কথা বলতে হবে।

মুবারক! তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কী বলতে চাও, কী বুঝাতে চাও পরিস্কার করে বল।

ঃ জনাব! আপনি আমাকে রেখেছেন বাগান দেখাশুনা ও পরিচর্যা করার জন্য। খাওয়ার অনুমতি তো পাইনি। সুতরাং আপনিই বলুন, বিনা অনুমতিতে অন্যের জিনিস কিভাবে আমি খাবো? এটা কি আমানতের খেয়ানত নয়? এর জন্য কি আল্লাহর দরবারে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না?

মুবারকের কথায় কাজী সাহেব খুশি হলেন। মনে মনে বললেন, সে তো কেবল বুদ্ধিমানই নয়, খোদাভীরু আল্লাহ ওয়ালাও বটে। আমি তার চেহারা দেখে যতটুকু সৎ ও বুদ্ধিমান বলে মনে করেছিলাম, সে তো তার চেয়েও অনেক বেশি। আহা! দুনিয়ার সব মানুষ যদি এমন হতো।

সেদিন বাসায় ফিরে কাজী সাহেব স্ত্রীর নিকট সবকিছু খুলে বললেন। স্বামীর কথাগুলো স্ত্রী তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। ভাবছিলেন তিনি, ক্রীতদাসরাও তাহলে খোদাভীরু-হয়, তাদের অন্তরেও সদা সর্বদা জাগ্রত থাকে পরাক্রমশালী আল্লাহর সীমাহীন ভীতি। আহা! আমার মেয়ের জন্য যদি এমন একটি ছেলে পেতাম।

পিতা যখন মায়ের নিকট মুবারকের ঘটনা বর্ণনা করছিল তখন মেয়েও দরজার আড়াল থেকে সবকিছু শুনছিল। তার হৃদয় রাজ্যেও তখন বয়ে চলছিল এরূপ একজন স্বামীর কল্পনাই।

কয়েকদিন পর। কাজী সাহেব বিষন্ন মনে বসে আছেন। মনটি তার একদম ভাল নেই। স্ত্রী বলল, কি ব্যাপার? আপনাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছে। কিছু চিন্তা করছেন বুঝি?

স্ত্রীর কথায় কাজী সাহেব সম্বিত ফিরে পেলেন। বললেন- হ্যাঁ, তোমার মেয়েকে নিয়ে কেন জানি আজ ভীষণ চিন্তা হচ্ছে। মেয়ের বয়স বেড়ে যাচ্ছে। অথচ আজও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না।

স্ত্রী বললেন আজ সকালে আমার মাথায় একটি বুদ্ধি এসেছে। আপনি অনুমতি দিলে বলতে পারি।

ঃ বল, অবশ্যই বল।

ঃ আমাদের ক্রীতদাস মুবারক। সে একটি আল্লাহ ওয়ালা ছেলে। এ কথা আপনিই আমাকে বলেছেন। তার খোদাভীরুতা ও পরহেযগারীর ব্যাপারে আমারও কোন সন্দেহ নেই। আমি মনে করি এত পেরেশান না হয়ে পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে তার সাথেই আমরা পরামর্শ করতে পারি।

ঃ হ্যাঁ, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। এ সহজ কথাটি এত দিন আমার মাথায় আসে নি। ক্রীতদাস হলে কি হবে তার জ্ঞান কিন্তু মোটেও কম নেই।

ঐ দিন বিকালে মুবারককে ডেকে কাজী সাহেব বললেন-

ঃ মুবারক! আমরা তোমাকে অনেক স্নেহ করি। নিজ সন্তানের মতই হৃদয় দিয়ে ভালবাসি। এখন তোমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের জন্য ডেকেছি। তুমি জান, আমাদের একটি মেয়ে আছে। বিভিন্ন স্থান থেকে তার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে; কিন্তু আমি স্থির করতে পারি নি কার সাথে তার বিয়ে দেব! এখন তুমিই বল আমি কি করতে পারি?

মুবারক বলল, এ তো কঠিন কিছু নয়। ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগে কাফিররা ছেলে-মেয়েদের বিয়ের বেলায় বংশকে প্রধান্য দিত। পাত্র বা পাত্রী যদি নামকরা বিখ্যাত বংশের হত, তবে তার অন্য কোন গুণ আছে কি নেই, তা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করত না।

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা রূপ সৌন্দর্যের বিচার করত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশদীনের জামানায় মানুষ আল্লাহ ভীতি ও পরহেযগারীর কথা ভাবত। আর বর্তমান যুগে মানুষ প্রাধান্য দেয় টাকা পয়সা ও ধন ঐশ্চর্যকে। সুতরাং আপনি উল্লেখিত বিষয়গুলো থেকে যে কোন একটিকে মাপকাঠি বানিয়ে মেয়ের জন্য পাত্র নির্বাচন করে ফেলুন।

মুবারককে তখনকার মত বিদায় দিয়ে কাজী সাহেব স্ত্রীকে নিয়ে বসলেন। তারপর মুবারকের কথাগুলো নিয়ে উভয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করলেন। বললেন, যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দ্বীনদারী থাকে তবে অন্যান্য ব্যাপারে কিছুটা কমতি থাকলেও কোন অসুবিধা নেই। তাদের দাম্পত্য জীবনে অবশ্যই সুখ শান্তি আসবে। কিন্তু দীনদারী ব্যতীত অন্য দিকগুলো পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকলেও প্রকৃত শান্তি যে আসবে না একথা নিশ্চিত করেই বলা যায়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত তারা খোদাভীতি ও দ্বীনদারীর দিকটিকেই মাপকাঠি বানিয়ে মেয়ের জন্য পাত্র নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

এবার মাপকাঠি অনুযায়ী পাত্র নির্বাচনের পালা। দেখা গেল, এ পর্যন্ত যারা প্রস্তাব পাঠিয়েছে তাদের কেউই এ মাপকাঠিতে টিকে না। কারো বংশ ভাল, কেউ রূপ সৌন্দর্যে অতুলনীয়, আবার কেউ কেউ অঢেল ধন সম্পদের মালিক, কিন্তু পূর্ণ দ্বীনদারী ও খোদাভীতি কারো মধ্যেই নেই। এখন তবে উপায়?

উপায় এখন একটিই। প্রকৃত দ্বীনদার ছেলে পেতে হলে মুবারকের হাতেই মেয়েকে তুলে দিতে হবে। তাকেই বরণ করতে হবে একমাত্র জামাতা হিসেবে। কিন্তু সে যে ক্রীতদাস। মেয়ে কি তাকে মেনে নিবে? গ্রহণ করবে তাকে স্বামী হিসেবে? এ তো এক বিরাট প্রশ্ন।

স্ত্রী কাজী সাহেবকে বললেন, এত চিন্তার প্রয়োজন নেই। আমি মেয়ের সাথে আলাপ করে নেই। দেখি, সে কি বলে।

মা মেয়েকে সবকিছু বললেন। মেয়েটি নিজে দ্বীনদার হওয়ার কারণে সেও দ্বীনদারীকেই প্রাধান্য দিল। মুখে শুধু এতটুকু বলল, আম্মাজান! আমি

যে পাতায় যা আছে

এ যাবত কখনোই আপনাদের মতের বিরুদ্ধে কিছু করি নি। ভবিষ্যতেও করব না, ইনশাআল্লাহ। এ ব্যাপারে যা ভাল মনে করেন তাই করুন। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

মেয়ের কথায় মায়ের মন খুশিতে নেচে উঠল। তিনি মেয়ের কাছ থেকে এমন উত্তরই আশা করছিলেন। স্বামীকে এক রকম দৌড়ে এসে বললেন, মা আমার রাজি আছে। এবার সামনের করণীয় ঠিক করুন।

সংবাদ শুনে কাজী সাহেবের চোখে মুখে ফুটে উঠল এক অপূর্ব আনন্দ উচ্ছাস। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রীতদাস মুবারককে ডেকে পাঠালেন। বললেন, মুবারক! আমি তোমার মধ্যে যে যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা দেখতে পেয়েছি, বর্তমানকালে তা সত্যি বিরল। আমার ইচ্ছা, যদি তুমি রাজি থাক, তবে তোমার হাতেই আমার একমাত্র কন্যাকে তুলে দিব।

মুবারক বলল, হুজুর! আমি হলাম একজন ক্রীতদাস-গোলাম। আপনি পয়সার বদলে আমাকে খরিদ করেছেন। তদুপরি আপনি হলেন অত্র এলাকার কাজী ও সম্মানী ব্যক্তি। আপনার কথায় কত লোক উঠা বসা করে। শুনেছি, আপনার মেয়েও নাকি অনিন্দ্য সুন্দরী। সুতরাং আপনার মত একজন মহান ব্যক্তির মেয়ের বিবাহ একজন ক্রীতদাসের সাথে কি করে হতে পারে? তাছাড়া আপনার মেয়েই বা বিষয়টিকে কিভাবে মেনে নিবে?

কাজী সাহেব বললেন, মুবারক! তুমি গোলাম হওয়ার প্রশ্ন তুলেছ? যাও, এখন থেকেই তুমি আযাদ-মুক্ত-স্বাধীন। আর মেয়ের মতামত আমরা নিয়েছি। সে তোমার ব্যাপারে ইতিবাচক অভিমত প্রকাশ করেছে। অতঃপর কাজী সাহেব মুবারকের সাথে আপন মেয়ের বিয়ে দিলেন এবং উভয়কে প্রচুর ধন সম্পদ দান করলেন। তখন থেকেই শুরু হল মুবারকের নতুন জীবন।

এক সময় তাদের কোল জুড়ে জন্ম নিল এক পুত্র সন্তান। স্বামী স্ত্রী পরামর্শ করে নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ। এ হল সেই ছেলে যিনি গোটা দুনিয়ায় আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক নামে খ্যাতি লাভ করেছেন। যিনি কেবল একজন বড় মুহাদ্দিসই ছিলেন না, মহাজ্ঞানী ও সম্মানিত সাধকও ছিলেন। এ মহা মনীষীর কয়েকটি ঘটনা হৃদয় গলে সিরিজের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.smfoundationbd.com

সম্মানিত পাঠক পাঠিকা! আলোচ্য ঘটনা থেকে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। যথা-

১। দ্বীনদারীর ফলাফল কেবল আখেরাতে নয়, দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। তাইতো একজন ক্রীতদাস হয়ে মুবারক কেবল কাজী সাহেবের রূপসী কন্যাকেই লাভ করেনি, গোলামীর জিঞ্জিরও গর্দান থেকে চিরতরে অপসারিত হয়েছে।

২। স্বামী স্ত্রী বা পাত্র পাত্রী নির্বাচনের সময় অতশত চিন্তার প্রয়োজন নেই। সর্বাগ্রে প্রয়োজন দ্বীনদারী। দ্বীনদারী থাকলে অন্যান্য দিকগুলো হালকা নজরে দেখলেও কোন সমস্যা নেই। কিন্তু দ্বীনদারীর পরওয়া না করে কেবল অন্যগুলো তালাশ করলে ফলাফল অনেকটা ঐ রকমই হতে পারে যেমন হয় সংখ্যার বাম দিকে শূন্য বসালে।

৩। ছেলে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সময় স্ত্রীর সাথেও পরামর্শ করা উচিত। সেই সাথে পাত্র সকল অবস্থা তুলে ধরে ছেলে-মেয়েদের মতামতও নেওয়া প্রয়োজন।

হে আল্লাহ! উল্লেখিত ঘটনার শিক্ষণীয় দিকগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান কর। আমীন।

[সূত্র ঃ আত তিবরুল মাসবুক।]

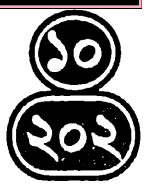

চরম শাস্তি

ইহুদিরা মুসলমানদের গোড়ার শত্রু। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এদের ষড়যন্ত্র এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত এদের নানাবিধ চক্রান্ত ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত গতিতে চলে আসছে। এরা আমাদের গৌরবময় অতীতকে যেমন আত্ম দ্বন্দ্বের যাতাকলে দলিত মথিত করেছে, ঠিক তেমনি এদেরই ষড়যন্ত্রে আমরা লহুসিক্ত হয়েছি জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনে। এদের নির্মম আঘাতে যেমন সায়্যিদুনা হযরত ওমর (রা.) শহীদ হয়েছেন, ঠিক তদ্রুপ সর্বশ্রেষ্ঠ মাজলুম শহীদ হযরত উসমান (রা.)কেও হারিয়েছি চিরদিনের মত। শুধু তাই নয় নবীজীর নয়নের মনি, হযরত ফাতিমার কলিজার টুকরা, মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ের ধন সায়্যিদুনা হযরত হুসাইন (রা.) কারবালার প্রান্তরে নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন দুষ্ট ইহুদিদের গভীর কূট কৌশলের ফলেই।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলাম বিদ্বেষী ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের মুখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাল ছেড়ে বসে থাকেননি এবং নীরব নিশ্চুপ থেকে তা হজম করেও নেননি। বরং তাদের প্রতিটি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যথাসময়ে কঠোর ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও কুমতলবকে গুড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরকে প্রদান করেছেন সমুচিত শাস্তিও।

কাব ইবনে আশরাফ ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়কার এক পাপিষ্ঠ ইহুদি। সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালি গালাজ করত। কবিতা রচনা করে তার নির্মল ও নিষ্কলুষ চরিত্রে কালিমা লেপনের চেষ্টা করত। তার শানের খেলাফ এমন অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করত যা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী চেতনায় শক্তভাবে আঘাত হানত।

তার কুকর্মের ফিরিস্তি এখানেই শেষ নয়। সে লোকজনকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত। মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। এমনকি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দিয়ে এনে হত্যা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র সেই এঁটেছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাথমিক পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরামকে ধৈর্য ধারণের আদেশ দিয়েছেন। কাব ইবনে আশরাফকে সৎ পথে ফিরে আসার অনেক সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন সে অসৎ পথ থেকে ফিরে আসল না, এমনকি তার অপকর্ম দিন দিন বাড়তে লাগল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন।

একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কাব ইবনে আশরাফকে হত্যা করতে পারবে? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অনেক কষ্ট প্রদান করছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি পারব। তবে আমাকে এমন কিছু অস্পষ্ট ও একাধিক অর্থবোধক শব্দ উচ্চারণ করার অনুমতি দিন, যা বাহ্যিকভাবে তার প্রশংসা বুঝালেও প্রকৃত পক্ষে আমি অন্য অর্থেই তা ব্যবহার করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলেন।

দু একদিন পর। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) অভিশপ্ত ইহুদি কাব ইবনে আশরাফের নিকট গেলেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করলেন। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে আলাপ শুরু হলে কথা প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন-

এই লোকটির কথা কি আর বলব। তিনি তো আমাদেরকে জ্বালিয়ে মারছেন। নানাবিধ কষ্টে নিপতিত করছেন। তার কথায় তো যাকাত সদকা আর দান খয়রাত করতে করতে একদম নিঃস্ব হয়ে গেছি। পড়ে গেছি বড় অভাবের মধ্যে। আর এজন্যেই আপনার কাছে ঋণ নেওয়ার জন্য চলে এসেছি।

উল্লেখ্য যে, যাকাত দিলে, দান খয়রাত করলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে নফসের বড় কষ্ট হয় এতে কোন সন্দেহ নেই। আর উপরের বক্তব্যের দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) এ বাহ্যিক অর্থটিই কাব বিন আশরাফকে বুঝাতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে দ্বীনদার ও নিষ্ঠাবান লোকেরা দান সদকা প্রদান ও গরিবদের সাহায্য সহযোগিতা করার দ্বারা অন্তরে এক গভীর প্রশান্তি অনুভব করেন। এমনকি আল্লাহর রাহে মাল খরচ করতে না পারলে তারা কষ্ট অনুভব করেন।

মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) এর কথায় কাব ইবনে আশরাফ বেশ পুলকিত হল। মনটা তার খুশিতে ভরে উঠল। কথাটিকে আরো জোড়ালো করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আরে- এ আর এমন কি দেখলে! দেখার সময় তো সামনে আসছে মাত্র। ভবিষ্যতে যে তোমাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে সে চিন্তাই আমি করছি।

মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) বললেন, আমরা যেহেতু তাঁর [মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর] অনুসারী হয়ে পড়েছি কাজেই তাকে আপাতত ছেড়ে দিতে পারছি না। এজন্য পরিণামের অপেক্ষায় আছি। [এ কথা দ্বারা কাব ইবনে আশরাফ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মন্দ পরিণামের কথা বুঝলেও মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিজয় ও কাফিরদের পরাজয়ের কথাই বলেছেন]

কাব বিন আশরাফ বলল-

ঃ তোমরা ঋণ নাও তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে বন্ধক হিসেবে কিছু রেখে যাও।

ঃ বন্ধক হিসেবে আপনি কি চান?

যতদিন তোমরা ঋণ পরিশোধ না করবে ততদিন তোমাদের স্ত্রীরা আমার কাছে থাকবে। (লোকটির অন্তরটা যে কত খারাপ ও অপরিচ্ছন্ন এ কথাটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ)

ঃ দু'কারণে আমরা তা পারছি না। একে তো এর দ্বারা আমাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগবে। দ্বিতীয়ত আপনি হলেন সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী একজন নওজয়ান।

ঃ তাহলে তোমাদের ছেলেদেকে বন্ধক রাখ।

ঃ এও সম্ভব নয়। কারণ লোকজন আমাদের ছেলেদেরকে এ বলে আজীবন ধিক্কার দিবে যে, তোমরা হলে ঐসব লোক যাদেরকে দু'তিন সের আটার জন্য মানুষের নিকট বন্ধক রাখা হয়েছিল।

ঃ তাহলে তুমি কী রাখতে চাও?

ঃ হাতিয়ারের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমরা আপনার নিকট সেগুলো বন্ধক রাখতে পারি।

ঃ ঠিক আছে। রাত্রে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এসো এবং ঋণ নিয়ে যেও।

ঃ আচ্ছা, তাই হবে।

ওয়াদা অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) রাতের বেলা তার কয়েকজন সঙ্গীসহ কাব বিন আশরাফের বাড়িতে গেলেন। অতঃপর তাকে ডাক দিলে সে দূর্গ থেকে নিচে নামতে লাগল। স্ত্রী বলল, এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ?

কাব বলল, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা আর আমার দুধ শরিক ভাই আবু নায়েলার নিকট যাচ্ছি। তুমি চিন্তা করো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসব।

স্ত্রী বলল, আমি এই শব্দে রক্ত উদগীরণের আলামত অনুভব করছি।

কাব বলল, কোন শরীফ লোককে গভীর নিশীতে বর্শা মারার জন্যও যদি ডাকা হয় তবুও তার ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত। একথা শুনে স্ত্রী কথা না বাড়িয়ে চুপ রইল।

ইত্যবসরে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) তার সাথীদের বলে দিয়েছেন কাব আস্‌লে আমি তার চুলের ঘ্রাণ নেব। যখন দেখবে আমি

তার চুল দৃঢ় করে ধারণ করেছি তৎক্ষণাৎ তার মস্তক উড়িয়ে দিবে।

একটু পর কাব ইবনে আশরাফ আসল। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) বললেন, আজকের ন্যায় সুঘ্রাণ আমি আর কোনদিন আস্বাদন করি নি।

কাব বলল, আমার নিকট আরবের অনেক সুন্দরী রূপসী নারী আছে। এরা সুঘ্রাণ খুব পছন্দ করে। এজন্য আমি এগুলো ব্যবহার করে থাকি।

মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) বললেন, যদি কিছু মনে না করেন, তবে আমাকে আপনার সুবাসিত মস্তক থেকে সুঘ্রাণ নেওয়ার অনুমতি দান করুন।

কাব ঠিক আছে বলে মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে দিল। মুহাম্মদ বিন মাসলামা ও তার সঙ্গীগণ ঘ্রাণ আস্বাদন করলেন। কিছুক্ষণ পর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) পুনরায় বললেন -

আপনি কি আমাকে দ্বিতীয়বার মাথার ঘ্রাণ নেওয়ার সুযোগ দিয়ে বাধিত করবেন?

কাব ভাবল, আমার আজকের সুঘ্রাণটা এদের খুব পছন্দ হয়েছে বুঝি। তাই ভিতরে ভিতরে সে বেশ খুশি হল। বলল, ঠিক আছে, তুমি ইচ্ছামত সুঘ্রাণ আস্বাদন কর।

মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) কাবের কাছে গেলেন এবং ঘ্রাণ গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এক পর্যায়ে সুযোগ বুঝে মাথার চুল খুব মজবুত করে ধরলেন এবং সঙ্গীদেরকে ইঙ্গিত দিলেন।

সঙ্গীরা তৈরিই ছিল। ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র একজন ধারাল তরবারীর এক আঘাতে কাবের মস্তক দ্বিখন্ডিত করে ফেললেন। অতঃপর তারা ইসলামের এ চির শত্রুর মাথা নিয়ে শেষ রাত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের দেখেই বললেন, এরা সফলতা অর্জন করেছে। এদের চেহারা উজ্জ্বল হোক।

তারা উত্তরে বললেন, সর্বাগ্রে আপনার চেহারা মোবারক হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ।

এরপর তারা ঘৃণিত ইহুদি কাব ইবনে আশরাফের ছিন্ন মস্তক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে রাখলেন। তখন রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলহামদু লিল্লাহ বলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন।

এদিকে কাব ইবনে আশরাফের নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে ইহুদীরা বিচলিত হয়ে পড়ল। প্রভাতে তাদের একটি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, আমাদের নেতাকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন উপায়ে কষ্ট দিত এবং লোকদেরকে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর পক্ষ থেকে এরূপ জবাব শুনে তারা নিরুত্তর হয়ে গেল। জবাব দেওয়ার মত কোন কথা খুঁজে পেল না। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, ভবিষ্যতে কখনো তারা এমন কাজ করবে না।

প্রিয় পাঠক! কাব ইবনে আশরাফ মারা গেছে ঠিকই, কিন্তু সে রেখে গেছে তার দোসরদের। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা নামে এক কুখ্যাত মুনাফিক ছিল সেসব দোসরদেরই একজন। এই অভিশপ্ত লোকটি হযরত উসমান (রা.) এর শাসনকালে হিজরি ২৫ সনে ছদ্মবেশ ধারণ করে মুসলমান হয় এবং ইসলামি খিলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার বহু সূদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তাকে সাহায্য করে অনেক সংখ্যক মুনাফিক যারা ইসলামের মূলে আঘাত হানার মানসে বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা.) এর খিলাফত কালে যেসব ইহুদী মুনাফিক কখনো চোখ খোলার সাহস পেত না, আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা তাদেরকে নিয়ে একটি গোপন দল গঠন করে এবং একের পর এক এমন নীল নকশা বাস্তবায়ন করে চলে যা ভাবতে গেলেও গা শিউরে উঠে। ইতিহাসে এরা খারেজী বা সাবায়ী গোষ্ঠী নামে পরিচিত।

প্রিয় বন্ধুগণ! সাবায়ী গোষ্ঠীর দুষ্কর্মের খতিয়ান লিখতে গেলে আরেকটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করতে হবে। সেগুলো সুযোগ পেলে আল্লাহ চাহে তো অন্য সময় সংক্ষেপে আলোচনা করব। এখন শুধু একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। কথাটি হল-

যে পাতায় যা আছে

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সাবায়ী গোষ্ঠী ইসলামি খিলাফত ব্যবস্থাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র আঁটে এবং অপপ্রচার চালায়। এসব ষড়যন্ত্রের মধ্যে একটি মারাত্মক ষড়যন্ত্র এও ছিল যে, সত্যকে জীবন্ত কবর দিয়ে হাজারো মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বিভিন্ন রকম বই পুস্তক রচনা করা। ইবনে সাবার দল এসব পুঁথি পুস্তকে মিথ্যার বহর এভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, পরবর্তী অনেক ইতিহাস লেখক সেসব মিথ্যা গুজব সর্বস্ব পুঁথি পুস্তক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। ফলে এর অনিবার্য পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, এসব ইতিহাস লেখকের তথাকথিত ইতিহাস পড়ে আজ বহু সরল প্রাণ মুসলমান হযরত উসমান (রা.) ও হযরত মুআবিয়া (রা.) সহ বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবীর ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। শুধু তাই নয়, এসব লেখনির বদৌলতে আজ মুসলিম উম্মাহর বহু লোক হযরত সাহাবায়ে কেরাম থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, আবার অনেকে হয়ে পড়েছে সাহাবী বিদ্বেষীও। (নাউযুবিল্লাহ)

আরো অধিক পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আধুনিক শিক্ষা অর্জনের জন্য যারা স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটিতে গমন করেন, ইসলাম ও ইসলামের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে তাদের সম্যক ধারণা না থাকায় তারা আরো বেশি বিভ্রান্ত হচ্ছেন। কারণ ইসলামের ইতিহাস নামে যেসব বই তাদের পাঠ্য সূচিতে রয়েছে, তা বৃটিশ উপনিবেশিক কর্তৃক প্রণীত সিলেবাসেরই অংশ। আর বৃটিশরা যে কখনোই ইসলাম ও মুসলমানদের মঙ্গল চায়নি, তা বলাই বাহুল্য। তাই তাদের প্রণীত সিলেবাসে সঠিক ঐতিহ্যপূর্ণ ইসলামি ইতিহাসের পরিবর্তে ভ্রান্তিকর ইতিহাস স্থান পাওয়াই স্বাভাবিক।

মুহতারাম পাঠকবৃন্দ! আমি যখন মাদরাসা দারুর রাশাদ (মিরপুর ১২, ঢাকা) থেকে দাওরা ফারেগ হয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য আরবি, ইসলামি শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করতে থাকি, তখন কিছু বিকৃত ইতিহাস আমাকে দারুণভাবে পীড়িত করে। হৃদয়ের গভীরে অনুভব করি প্রচন্ড ব্যথা। বিশেষ করে ঐ সময় আমার বুক ফেটে কান্না আসে যখন দেখি ইতিহাসের প্রায় সব কটি বই ও গাইডে অকুতোভয় সিপাহসালার ওহী লেখক ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খাস দুআ প্রাপ্ত বিখ্যাত সাহাবী হযরত আমীরে মুআবিয়া

www.smfoundationbd.com

(রা.) এর শানে ব্যবহার করা হয়েছে এমন কিছু মারাত্মক শব্দ যা উচ্চারণের সাথে সাথে দেহের লোমকুপগুলো খাড়া হয়ে উঠে। সেখানে এই মহান সাহাবীকে ধুরন্দর ধূর্ত, শঠ ও প্রতারক হিসেবে আখ্যায়িত করে এমনভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে যা ভাবতে গেলেও লজ্জায় মাথা নূয়ে আসে।

একদিন আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিশ্বকোষ বিভাগের পরিচালক, জগত বিখ্যাত মনীষী আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী (র.) এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (দা. বা.) এর সাথে সাক্ষাত করে এ ব্যাপারে আলাপ করি। তার সাথে আমার বহু দিনের পরিচয়। স্নেহ করে তিনি আমাকে নাম ধরেই ডাকেন। সেদিন আমার মুখ থেকে এসব শুনে বললেন, হ্যাঁ, এ ব্যাপারটি আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলছে। মুফীজ! এ ব্যাপারে তুমি কিছু লেখালেখি কর।

সেদিন থেকে এরাদা করেছিলাম, যদি আল্লাহ পাক তাওফীক দেন তবে এসব বিষয়ে কিছু লিখব। আজ প্রসঙ্গক্রমে কিছু কথা লিখতে পেরে তাঁর সেই নির্দেশ সামান্য পরিমান হলেও পালন করেছি। এজন্য আল্লাহ পাকের দরবারে জানাই লাখো কোটি শুকরিয়া। যদি পাঠকবৃন্দ দুআ করেন আর আল্লাহপাকের রহমত শামেলে হাল হয় তবে ভবিষ্যতে আরো কিছু লিখার পূর্ণ ইচ্ছা আছে। হে রাহমানুর রাহীম! তুমি তাওফীক এনায়েত কর।

[সূত্র ঃ তাবাকাতে ইবনে সাদ। সহায়তায় ঃ সীরাতে মুস্তফা ২ঃ১৭৫, ইসলামী খিলাফত ধ্বংসের প্রকৃত ইতিহাস ঃ৩৪]

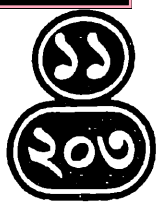

কে অধিক দানশীল?

তিন বন্ধু। মক্কা মুকাররমায় থাকেন। প্রত্যহ কোন এক সময় একত্রে মিলিত হন। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। কখনো কোথাও বেড়াতে যান। নামাজের সময় হলে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করেন। অবশেষে যার যার বাসায় ফিরে আসেন।

একদিন তিন বন্ধুর মধ্যে বিতর্ক শুরু হল। বিতর্কের বিষয় হল, বর্তমান সময়ে মক্কা শহরে সবচেয়ে বড় দানশীল কে? প্রত্যেকেই যার যার অভিমত পেশ করল। কিন্তু একজনের মত অন্যজনের সঙ্গে মিলল না।

প্রথম ব্যক্তি বলল, বর্তমানে এ শহরে সবচেয়ে বড় দানবীর হলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর (রা.)।

দ্বিতীয় জন বলল, আমি তোমার সাথে একমত নই। আমার মতে এ শহরের সবচেয়ে বড় দানশীল হলেন কায়েস বিন সাআদ (রা.)

তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমি তোমাদের কারো কথা সমর্থন করতে পারলাম না। আমি মনে করি বর্তমান কালে শায়েখ আরাবাহ (র.)-এর চেয়ে বড় কোন দাতা এ শহরে নেই।

এবার প্রত্যেকেই যার যার মতের স্বপক্ষে দলিল ও যুক্তি পেশ করল। উল্লেখ করল বিভিন্ন উদাহরণ। কিন্তু কোন সুরাহায় পৌছা সম্ভব হল না। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল, যে যার নাম বলেছে সে তার কাছে যাবে এবং আজই নগদ ও বাস্তব প্রমাণ নিয়ে ফিররে।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রথম ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (র.) এর নিকট গেল। সে তার নিকট একজন সওয়ালকারীর বেশে উপস্থিত হল। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (র.) দীর্ঘ সফরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি উটের উপর উঠে বসছিলেন। সে তার নিকট গিয়ে বলল, হে দানবীর! আমি এক বিপদগ্রস্থ মুসাফির। বাড়িতে ফেরার মত প্রয়োজনীয় অর্থ বা বাহন কোনটি আমার নিকট নেই। মেহেরবানী করে আমাকে কিছু সাহায্য করুন। লোকটির অভাবের কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (র.) সমবেদনা প্রকাশ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজে সফরের ইরাদা পরিত্যাগ করে বললেন, হে মুসাফির! এখন আমার নিকট একখানা উট, পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও কয়েক থান রেশমী কাপড় আছে। তুমি এগুলো নিয়ে যাও এবং আপন প্রয়োজন পূর্ণ কর।

এদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি কায়েস ইবনে সাআদ (র.) এর নিকট উপস্থিত হল। কায়েস (র.) তখন ঘুমাচ্ছিলেন। গোলাম বলল, আমার মনিব এখন ঘুমিয়ে আছেন। তাকে জাগাতে চাই না। আপনি কেন এসেছেন আমার নিকট বলুন। সম্ভব হলে আমিই এর ব্যবস্থা করব।

লোকটি গোলামের নিকট স্বীয় অভাবের কথা বলে সাহায্যের আবেদন জানাল। গোলাম দেরী করল না। সাথে সাথে ঘরের ভিতরে গিয়ে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ফিরে এল। বলল, এগুলো নিন, এ মুহূর্তে ঘরে এ পরিমাণ অর্থই ছিল। তারপর সে লোকটির হাতে একটি চিরকুট দিয়ে বলল, অমুক স্থানে গিয়ে চিরকুটটি দেখালে একটি ঘোড়া ও একটি উট পেয়ে যাবেন। লোকটি চিরকুট ও স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর হযরত কায়েস (র.) ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। তারপর গোলামের মুখ থেকে সবকিছু অবগত হয়ে এতটাই খুশি হলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে গোলামকে আযাদ করে দিলেন। সেই সাথে এ কথাও বললেন যে, হায়! তুমি যদি আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতে তাহলে আমি এই কৃপণতা করতাম না।

তৃতীয় ব্যক্তি শায়েখ আরাবার নিকট পৌঁছে অভাব অনটনের কথা জানাল এবং সাহায্যের প্রার্থনা করল। শায়েখ তখন নেহায়েত দুর্বলতার কারণে দু'জন গোলামের কাঁধে ভর করে কোথাও যাচ্ছিলেন। লোকটির

প্রার্থনা শুনে তার দু'চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি অতি কষ্টে গোলামদের থেকে পৃথক হলেন এবং সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর আফসোস করে বললেন, হায়! তোমাকে দেওয়ার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ ধন-সম্পদ যদি আমার নিকট থাকত। যাহোক, এখন আমার এ দুটি গোলাম উপস্থিত আছে, তুমি এদের গ্রহণ করো।

সওয়ালকারী শায়েখের দান গ্রহণ করল না। কারণ সে তো মূলতঃ সাহায্যের জন্য আসেনি। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এসেছে। যখন সে দেখল, বৃদ্ধ শায়েখ এ দুটি গোলামের সাহায্য নিয়েই চলাফেরা করে তখন তার কষ্টের কথা ভেবে সে এ দান গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল। এবার শায়েখ আরাবাহ (র.) বললেন, যদি তুমি আমার এ দুটি গোলাম গ্রহণ না কর তাহলে আমি এদেরকে এক্ষুণি আযাদ করে দিচ্ছি। এ বলে তিনি গোলাম দুটি আযাদ করে দিলেন এবং অনেক কষ্টে চলাফেরা করতে লাগলেন।

ঐদিন রাতে তিন বন্ধু আবার একত্রিত হল। একে একে নিজ নিজ নতুন অভিজ্ঞতা সবাই বর্ণনা করল। কিন্তু এবারও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল না যে, এই তিন মহান ব্যক্তির মাঝে কে অধিক দানশীল।

প্রিয় পাঠক! বর্ণিত ঘটনাটি কোন কল্পকাহিনী নয়। এটি একটি বাস্তব সত্য ঘটনা। আপনারা একটু চিন্তা করে দেখুন, বর্ণিত ঘটনায় যাদের আলোচনা এসেছে তাঁদের মন কত বড়? কত বিশাল ও উদার হৃদয়ের অধিকারী তাঁরা? একজন অভাবীর প্রয়োজন পূরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সফর বাতিল করে তদুপরি বাহন সহ সফরের সমস্ত সামানাদি দান করে ফেলা-এ কি কোন সাধারণ কথা? অথচ আল্লাহ মাফ করুক, আমাদের কারো কারো অবস্থা তো এই যে, কোথাও বের হওয়ার প্রাক্কালে কোন ভিক্ষুক যদি দু'পয়সা চেয়ে বসে তবে বিরক্তির সীমা থাকে না। এমন কি তখন দু'চার কথা শুনিয়ে ধমকি দিয়ে তাকে বিদায় করে দিতেও দ্বিধাবোধ করি না।

আরেকটু খেয়াল করে দেখুন, হযরত কায়েস (র.)-এর গোলাম তার মনিবের দানের ব্যাপারে কত বেশি আস্থাবান ছিলেন যে, তাকে না জানিয়ে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা অভাবী লোকটিকে দিয়ে দেওয়ার মত হিম্মত

যে পাতায় যা আছে

হল। আর ঐ মনিবের প্রতি কেনই বা আস্থা সৃষ্টি হবে না, যিনি গোলামের দানের কথা শুনে খুশি হয়ে তাকে মুক্তিই দিয়ে দিলেন। তদুপরি এ কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন যে, আমাকে জাগিয়ে দিলে আমি এই কৃপণতা করতাম না। লক্ষ্য করে দেখুন, দশ হাজার দিনার, একটি ঘোড়া ও একটি উটকে তিনি কৃপণতার দান বলে আখ্যায়িত করছেন। সুবহানাল্লাহ!

অপর দিকে শায়েখ আরাবাহ (র.) এর ব্যাপারটিও চিন্তা করে দেখুন যে, তিনি অভাবীর অভাব পূরণের জন্য কত বড় কুরবানি পেশ করেছেন। নিজে বৃদ্ধ। একাকী চলতে পারেন না। দুটি গোলামের সাহায্য নিয়ে চলাফেরা করেন। কিন্তু অভাবের কথা শুনে তাঁর কোমল হৃদয় এতটাই কোমল হল যে, এই গোলাম দুটিকে তিনি দিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

প্রিয় পাঠক! উল্লেখিত ঘটনা পাঠ করে গরিব দুঃখী অনাথ এতিম ও অভাবীদের প্রতি আমাদের মনেও যদি পূর্বের তুলনায় আরও অধিক পরিমানে সহানুভূতির ভাব সৃষ্টি হয় তবেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছ বলে মনে করব। হে করুণার আধার! তুমি আমাদের তাওফীক দাও। আমীন।

[সহায়তায় ঃ এমন মানুষ মিলবে না আর, মাওলানা শাববীর আহমাদ শিবলী।]

www.smfoundationbd.com

১২
২০৪

অবৈধ প্রেম ঃ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

নীরব একটি এলাকা। যদিও এলাকাটি শহরের সন্নিকটে তথাপি এলাকার মানুষগুলো একদম শান্ত। কেউ কোন ঝগড়া-ঝাটি পছন্দ করে না। তবে যুগের পরিবর্তনে কিছু সংখ্যক যুবক উৎপাত করার চেষ্টা করলেও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কারণে পারে না। পাশেই একটি নদী। রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধ হরেক রকমের গাছপালা। নদীর অনতিদূরে একটি কলেজ। কয়েকটি মাদরাসাও সেখানে রয়েছে। অনেক তালিবে ইলম দেশ-বিদেশ থেকে এসে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করে সেখানে।

মাহবুব নামের এক ছাত্র। সেখানকার এক কলেজে পড়ে। অত্যন্ত অমায়িক। আদর্শ ছেলে হিসাবে যদি কাউকে চিহ্নিত করতে হয় তাহলে সেই অগ্রাধিকার পাবে। তার চলা-ফেরা, কথা-বার্তা, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি মুগ্ধ করেছে এলাকার সকল মানুষকে, তার বুদ্ধিমত্তা জয় করেছে সকলের হৃদয়। ছোট হিসেবে তার যোগ্যতাও কম নয়। তার যোগ্যতা ও বুদ্ধির কাছে এলাকার ভাল ভাল লোকেরাও হার মানে। সকলেই এখন তার ভক্ত। আপন সন্তানের চেয়েও বেশি ভালবাসে তাকে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তার সুনাম। বয়স আনুমানিক ২০ বিশ হবে। এখনো বিয়ে-শাদি করে নি।

অনেক মেয়েরাও দুর্বল হয়ে পড়েছে তার প্রতি। সে এসবের প্রতি সে ভ্রুক্ষেপ করে না। সে তার নিজের মতই চলে। কিন্তু এমন দিন যায় না- যে, দিন কোন না কোন মেয়ে ফোন করে, সেই সাথে চিঠি পত্রও আসে মাঝে মধ্যে। কিন্তু তাতে মাহবুবের কিছু আসে যায় না। কারণ সে এসবকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। সে চায় তার ঘরে এমন একটি মেয়ে বধূ হয়ে আসুক যে হবে আল্লাহওয়ালা-পর্দানশীন। যার ব্যবহার হবে শান্ত কোমল, হবে স্বামী

ভক্ত। এমন একটি মেয়েকে ঘরে এনে তার ঘরকে আলোকিত করবে। গড়ে তুলবে একটি সুখের সংসার এবং পরকালেও হবে একে অপরের সাথী। এদিকে শয়তানও বসে নেই। সে সর্বদা মাহবুবের পিছনে লেগে আছে। একটি পুরুষকে খারাপ পথে নেয়ার বড় অস্ত্র হলো একটি নারী। আর ইবলিস বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নারী দিয়েই পুরুষদের ধ্বংস করে থাকে।

একদিনের ঘটনা। একটি ছেলে মাহবুবের কক্ষে প্রবেশ করে সালাম দিল। মাহবুব তার অভ্যাসানুযায়ী সালামের উত্তর দিয়ে স্নেহভরা কণ্ঠে ছেলেটির কুশলাদি জিজ্ঞাসা করল। অনেক কথাবার্তা হল দু'জনের মাঝে। এক পর্যায়ে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, ভাইয়া! আপনার নিকট কোন ভালো বই আছে? মাহবুব বলল, হ্যাঁ আছে। কেন তোমার লাগবে নাকি? ছেলেটি বলল, আপু একটি বই চেয়েছে আবার দিয়ে দিবে। মাহবুব বলল, না দেয়া লাগবে না। যদি তোমার আপু আমার বই পড়ে ভালো হতে পারে তাহলে দেয়া লাগবে না।

এভাবে একেক করে অনেক বই নিয়ে পড়েছে মেয়েটি। মাঝে মধ্যে প্রসংশামূলক অনেক লেখাও পাঠাতো মাহবুবের কাছে। এক পর্যায়ে মাহবুব বুঝতে পারল, মেয়েটি তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। মেয়েটির নাম মরিয়ম। সে আর মাহবুব যেন একই চরিত্রের। অন্য মেয়েরা যেভাবে খোলামেলা স্কুল কলেজে আসা যাওয়া করে। মরিয়ম কিন্তু একেবারে ভিন্নধর্মী। বোরকা পরে কলেজে আসা যাওয়া করে। কারো সাথে কোন প্রকার বেহুদা কথা-বার্তা বলে না। মরিয়মের চলাফেরায় মাহবুব মুগ্ধ হয়। এরকম একটি মেয়েই চেয়েছিল মাহবুব। তার সমস্ত গুণই মরিয়মের মধ্যে বিদ্যমান। মরিয়মও চায় একটি আলেম ছেলেকে স্বামী হিসেবে বরণ করতে।

কিন্তু চাইলে কি হবে? মরিয়মের বাবা আধুনিক যুগের একজন আধুনিক মানুষ। তাই মাহবুব চিন্তার সাগরে ডুবে গেল। চিন্তা করলো, এমন একটি ভাল মেয়ে যদি আজ মুসলমানরূপী একটি খৃষ্টানের ঘরে চলে যায় তাহলে ইহকাল-পরকাল সবই বরবাদ হয়ে যাবে। আর মেয়েটিও এখন অসহায়। তাই একে উছিলা স্বরূপ রক্ষা করার দায়িত্ব একমাত্র আমারই। তাই তার ডাকে সাড়া দেয়া দরকার। ইবলিস এসে কাঁধে বসল মাহবুবের। কোন দিকে তাকাল না সে, একবার ও ভেবে দেখলো না সে, কি এর পরিণাম। কত

লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হবে ভবিষ্যতে। যদিও মাহবুবের খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না; সে চেয়েছিল তার জীবনকে সুন্দর করে সাজাতে। একটি মেয়ে যদি তার উছিলায় সুন্দর করে তার জীবন গড়ে তুলতে পারে তাতেই সে স্বার্থক। তাই এক সময় মরিয়মের ডাকে সাড়া দিল মাহবুব। নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল এ মেয়েটিকে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত তাকে জীবন সঙ্গী করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। একদিন দু'জনের মুখোমুখি সাক্ষাত হল। অনেক কথাবার্তা হলো তাদের মধ্যে। এক সময় দু'জন দু'জনের প্রেমে ডুবে গেল। বহুদিন পর্যন্ত পত্র বিনিময় হল। এখন একে অপরকে ছাড়া কিছুই বুঝে না। দু'জন দু'জনকে না দেখে এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। গভীর সম্পর্কে আটকে গেল তারা। এক পর্যায়ে অভিভাবকদের না জানিয়ে শরিয়তের দৃষ্টিতে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার জন্য যতটুকু কথা-বার্তা এবং শর্তাবলী দরকার তা তারা শেষ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল। এর কারণ একটাই ছিল যে, যদি মেয়ের গার্ডিয়ান জেনে ফেলে তাহলে কখনো তারা এ সম্পর্ক মেনে নিবে না। তাই তারা এমন কাজ করতে বাধ্য হয়েছে।

এক সময় তারা সিদ্ধান্ত নিল, প্রমাণ স্বরূপ কাবিন করার প্রয়োজন। যেমন সিদ্ধান্ত তেমন কাজ। ঠিক এমন সময় মেয়ের ছোট চাচা যে কোনভাবে ঘটনাটি জেনে ফেলে। কাবিন আর করা হলো না, তখন থেকেই তাদের দু'জনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। এত দিনে মাহবুব মরিয়মের পিছনে অগণিত টাকা খরচ করেছে। যতদিক থেকে যত টাকা আসত তার অধিকাংশই মরিয়মের পিছনে ব্যয় করত। তাতে মাহবুবের কোন দ্বিধা ছিল না। সে মরিয়মের পিছনে টাকা খরচ করেও মনে বড় আনন্দ পেত।

যা হোক, ইবলিসের বাসনা এবার পূর্ণ হল। শুরু হল বেইজ্জতির পালা। পর্যায়ক্রমে এলাকার আরো কিছু লোক ঘটনাটি জেনে গেল। কেউ বিশ্বাস করছে, কেউ করছে না। কেউ কেউ কল্পনাও করতে পারছে না যে, এমন ছেলের দ্বারা এমন কাজ কি করে সম্ভব। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মান-সম্মান ধুলিস্যাত হয়ে গেল। গণপিটুনী ও ধিক্কার থেকেও রেহাই পেল না মাহবুব। অবশেষে কলংকের বোঝা মাথায় নিয়ে ঐ এলাকা থেকে চলে যেতে হল। এখন মরিয়ম কি করবে? দুঃখের অনলে পুরে ছারখার হয়ে গেল দু'জনের অন্তর। বিশেষ করে মরিয়ম এখন একেবারে নিরুপায়। সে এখন মা বাবার ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না। তাই বাধ্য হয়ে সব কিছু অস্বীকার করে ফেলে।

www.smfoundationbd.com

মাহবুব এসব কথা শুনে হতবাক, চিন্তা করল, হায় এখন মেয়েটার কি হবে? সেতো একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।

তাই সে মরিয়মের প্রেরিত পত্রগুলোর মধ্য থেকে বাছাই করে কয়েকটি পত্র তার পিতার নিকট পাঠাল। যে পত্রের মধ্যে মরিয়ম মাহবুবকে স্বামী বলে আখ্যায়িত করছে। কিন্তু তাতে তারা কর্ণপাত করল না। কারণ তারা তো আর শরিয়ত বুঝে না যে, মেয়ের বিবাহ হয়েছে, এখন তাকে অন্য কোথাও বিবাহ দেয়া যাবে না। পূর্বের বিবাহে থাকা অবস্থায় অন্যত্র বিবাহ দিয়ে স্বামী-স্ত্রী রূপী নারী-পুরুষের যাবতীয় কর্ম যেমন হারাম হবে তেমনি তাদের দৈহিক সম্পর্কের কারণে জন্ম নেওয়া সন্তানও হবে জারজ সন্তান। ইহকাল-পরকাল সবকিছুই ধ্বংস হবে। কিন্তু এ কথা কে বুঝাবে এদেরকে? একমাত্র মেয়েই প্রমাণ করতে পারে এর সত্যতা। রক্ষা করতে পারে এসব গুনাহর কাজ থেকে। না হয় এরা অবৈধ প্রেম-প্রীতির ভেলায় উঠে ধ্বংসের সাগরে ডুবে মরবে নিশ্চিত।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আজ পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি যে, অবৈধ সম্পর্কের দ্বারা মানুষ পুরোপুরি সুখি হতে পেরেছে। পক্ষান্তরে এ অবৈধ সম্পর্কের দ্বারা মান-ইজ্জত, সুনাম ইত্যাদি হারাতে হয়। হতে হয় লাঞ্ছিত ও অপমানিত। মাহবুব-মরিয়মই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাই আসুন, আমরা আজ থেকে দীপ্ত শপথ নেই, আমরা কোন দিন অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলব না। কারণ এর দ্বারা লাঞ্ছনা ও অপমান ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। নফছ ও শয়তানের ধোকা থেকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। কারণ যত বড় পীর দরবেশই হই না কেন শয়তান আমাদের পিছে লেগেই আছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে উপরোক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এসব কু-কর্ম থেকে দূরে থাকার তাওফীক দাও। আমীন। ছুম্মা আমীন।

(উপরোক্ত ঘটনাটি চাঁদপুরস্থ রঘুনাথপুর এলাকার ২০০৫ইং সালে সংগঠিত একটি সত্য ঘটনা। সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন- মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মিছবাহ, কুয়াকাটা, পটুয়াখালী)

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন?

[আকাবির শব্দটি আরবি "আকবার" শব্দের বহুবচন। 'আকবার' মানে অধিক বড়, শ্রেষ্ঠতর ইত্যাদি। সুতরাং আকাবিরে দেওবন্দ বলতে ঐতিহাসিক বিশ্ব বিশ্রুত ইসলামি বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে সংশ্লিষ্ট মনীষীদেরকেই বুঝায়। অন্য কথায়, দারুল উলূম দেওবন্দ যাদের চিন্তার ফসল, এর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় যারা ছিলেন প্রাণ পুরুষ এবং এখান থেকে যেসব সেবক ও সংস্কারক জন্ম নিয়েছেন তাঁদের সবাই হলেন আকাবিরে দেওবন্দ। চলমান অধ্যায়ে তাঁদের জীবনী নয় বরং জীবনের এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হবে যদ্বারা শিরোনামে উল্লেখিত প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত পরিষ্কার রূপে পাঠকদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। পূর্ববর্তী দুটি সিরিজে উক্ত শিরোনামের উপর মোট (১৮+১৭) ৩৫টি ঘটনা স্থান পেয়েছিল। এ সিরিজে আরো ১৮টি ঘটনা উল্লেখ করা হল। বর্ণিত ঘটনাগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরাও যেন অনুরূপ জীবন গঠনে সচেষ্ট হতে পারি- মহান আল্লাহর দরবারে এই প্রার্থনাই করি। -লেখক]

অপূর্ব বিনয়

এক তহসিলদার। দেওবন্দ থেকে বহু দূরে তার বাড়ি। ইতোপূর্বে তিনি 'শাইখুল হিন্দ' এর অনেক নাম ডাক শুনেছেন। কিন্তু কখনো তাকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

একদিন তার মনে শাইখুল হিন্দ (র.)কে দেখার আগ্রহ তীব্র হয়ে উঠে। সেদিন অফিস না থাকায় সকালেই তিনি দেওবন্দের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। তারপর অনেক পথ সফর করে দেওবন্দের একটি মসজিদে এসে উঠেন।

মূল মসজিদের অদূরেই একটি গোসলখানা ছিল। তহসিলদার ভাবলেন, দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। শরীরটাও ঘেমে উঠেছে। একটু গোসল করে নিলে মন্দ হয় না। এতে যেমন সফরের ক্লান্তি যেমন দূর হবে তেমনি মনটাও প্রফুল্ল হবে।

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (র.) এর অনেক বয়স হয়েছে। তহসিলদার যখন গোসলের কথা চিন্তা করছিলেন তখন তিনি সেই মসজিদেই ছিলেন। একজন বৃদ্ধ লোককে মসজিদে বসে থাকতে দেখে তহসিলদার তাকে

খাদেম বলে ধারণা করলেন। তাই আদেশের সুরে বললেন, ঐ মিয়া! আমি গোসল করব, বাথরুমে একটু পানির ব্যবস্থা করে দাও তো। আর শোন, গোসল শেষ হলে আমাকে শাইখুল হিন্দ (র.) এর দরবারে নিয়ে যেয়ো। তোমাকে আমি উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে দেব।

তহসিলদারের নির্দেশ পেয়ে লোকটি দ্বিতীয় কোন কথা বললেন না। অনেক কষ্ট করে পানি এনে বাথরুমে পৌঁছে দিলেন। তহসিলদার সাহেব এই ভর দুপুরে ঠান্ডা পানি পেয়ে বেশ আরামের সাথে গোসল করলেন। মনে মনে লোকটিকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর গোসল সেরে বাইরে এসে বৃদ্ধ লোকটিকে বললেন, এবার আমাকে শাইখুল হিন্দের দরবারে নিয়ে চল। আমি অনেক দূর থেকে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি। তুমি আগে চলবে আর আমি তোমার পিছনে পিছনে চলব। এই মহান বুযুর্গের নিকট আমাকে পৌঁছে দিয়েই তুমি তোমার পারিশ্রমিক নিয়ে চলে আসবে।

বৃদ্ধ লোকটি [শাইখুল হিন্দ (র.)] তহসিলদারকে নিয়ে সামনে এগুলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তহসিলদারকে বললেন, আচ্ছা ভাই! আপনি না কার সাথে দেখা করার ইচ্ছা করে ছিলেন?

বৃদ্ধের কথা শুনে তহসিলদারের রাগ চরমে উঠে। লোকটি অনুগ্রহকারী ও বুড়ো না হলে এতক্ষণে বোধ হয় দু'চারটি ঘা লাগিয়ে দিতেন। তিনি অনেক কষ্টে রাগটা নিয়ন্ত্রণে রেখে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, আমি কি তোমাকে আগেই বলি নি যে, আমি হযরত শাইখুল হিন্দের দরবারে হাজির হয়ে তার দর্শন ও উপদেশ গ্রহণের সৌভাগ্য লাভের জন্য এসেছি?

এবার সেই বৃদ্ধ লোকটি অত্যন্ত নম্র ও শান্ত স্বরে বললেন-ভাই! আমাকেও কিছু মানুষ শাইখুল হিন্দ বলে।

বৃদ্ধের কথায় তহসিলদার হতবাক হয়ে গেলেন। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তবে কি আপনিই শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী!

উত্তরে তিনি মুচকি হেসে বললেন- জী, লোকেরা তো তাই বলে।

তহসিলদার একথা শুনে তৎক্ষণাৎ হযরত শাইখুল হিন্দের পায়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করলেন। বারবার বলতে লাগলেন- হযরত! আপনি আমাকে আগে বললেন না কেন? আমি তো মারাত্মক অন্যায় করে ফেলেছি। আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কিন্তু শাইখুল হিন্দ (র.) তাকে সান্ত্বনার স্বরে অভয় দিয়ে বললেন, না ভাই, এতে কিছুই হয়নি। আপনি কোন অন্যায় করেননি। আপনার যদি আমার প্রতি .

সুধারণা থাকে আর আপনি আমাকে বড় কিছু মনে করে থাকেন তবে তো ইসলামের মূলনীতিই রয়েছে- জাতির সর্দার সেই, যে তাদের সেবা করে। এ মূলনীতি অনুসারে আপনিই আমার খেদমত পাওয়ার যোগ্য। তাছাড়া আপনি আমার মেহমান। মেজবানের উপর তো মেহমানের সেবা-যত্ন করার দায়িত্বই রয়েছে। একথা শুনে তহসীলদার সাহেব কিছুটা শান্ত হলেন। মহান আল্লাহ পাক হযরত শাইখুল হিন্দের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের জীবন ধন্য করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিঃদ্রঃ হযরত শাইখুল হিন্দ (র.) এর আরও কয়েকটি ঘটনার জন্য দেখুন ঃ সিরিজ-১১ঃ৮৭, ১২ঃ৮০-৮৫-৯৭

[সূত্র ঃ না কাবেলে ফারামুশ ওয়াকিআত। সহায়তায় ঃ ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে- মাওলানা খন্দকার মুশতাক আহমদ শরিয়তপুরী]

২
৩৭

শাইখুল হিন্দ কি জিনিষ

মাওলানা মুঈনুদ্দীন সাহেব ছিলেন মাকুলাতের (তর্ক শাস্ত্র) সর্বজন স্বীকৃত আলেম। আজমীরের মুঈনিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন বলে অনেককে তাকে মাওলানা আজমীরী বলে ডাকত। একদা তিনি শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম শুনে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দেওবন্দ আসেন এবং লোকদের জিজ্ঞেস করে হযরতের বাড়িতে যান।

তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। শাইখুল হিন্দ (র.) তখন গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। মাওলানা আজমীরী সাহেব এক ব্যক্তিকে গেঞ্জী লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় দেখে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দীর সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি। লোকটি মাওলানা আজমীরিকে সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং বড়ই সম্মান ও যত্নের সাথে ঘরে নিয়ে বসালেন। তারপর বললেন, আপনি আরাম করে বসুন, এখনই তার সাথে সাক্ষাত হবে।

লোকটির কথায় মাওলানা আজমীরী আস্বস্ত হলেন। ভাবলেন, শাইখুল হিন্দ হয়ত কোন কাজে বাইরে গেছেন। এক্ষুণি এসে পড়বেন। তাই তিনি অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ইত্যবসরে লোকটি শরবত এনে মাওলানা আজমীরীকে পান করতে অনুরোধ করলেন। মাওলানা আজমীরী শরবত পান শেষে বললেন, আমার সময় খুব কম। হযরতকে একটু খবর দিলে ভাল হয়।

লোকটি বললেন আপনি নিশ্চিন্তে আরাম করুন।

কিছুক্ষণ পর ঐ ব্যক্তি খানা নিয়ে এসে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে মাওলানা সাহেব পুনরায় বললেন, খানা-পিনা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আমি হযরতের সাথে দেখা করতে এসেছি। আপনি তাঁকে সংবাদ দিন।

ঐ ব্যক্তি বললেন, তিনি আপনার সংবাদ জানতে পেরেছেন, আপনি খানা খেয়ে নিন, এখনই সাক্ষাত হবে।

মাওলানা আজমীরী খাওয়া দাওয়া শেষ করার পর ঐ ব্যক্তি এসে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। যখন অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও কেউ এল না তখন মাওলানা আজমীরী সাহেব ঐ ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হয়ে বললেন- ভাই! আপনি তো শুধু শুধু আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন। আমি বারবার আপনাকে বললাম যে, শাইখুল হিন্দের সাথে সাক্ষাত করাই আমার উদ্দেশ্য কিন্তু এত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও আপনি তার সাথে আমাকে সাক্ষাত করালেন না।

জবাবে লোকটি বললেন, আসল কথা হল, এখানে মাওলানা কেউ নেই। অবশ্য মাহমূদ এই খাকছারের[১] নাম।

একথা শুনে মাওলানা মুঈনুদ্দীন আজমীরী যারপর নাই বিস্মিত হলেন এবং বুঝতে পারলেন শাইখুল হিন্দ কাকে বলে।

(আকাবের দেওবন্দ কেয়া থে, নূরাণী কাফেলা ঃ ২১)

৩

৩৮

কিতাবের আদব

হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) অনেক উঁচু পর্যায়ের বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। এই মহা মনীষীর দুটি ঘটনা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। (সিরিজ-১১ ঃ ৯২, সিরিজ-১২ঃ৮৭)। তিনি কিতাবপত্রের এত বেশি সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন যা বর্তমান জমানায় খুব কমই দেখা যায়। তিনি বলতেনই আমি কিতাবের অধীন কিতাব আমার অধীন নয়। কিতাব পড়ার সময় এ কথাটি আমি খুব ভাল করে খেয়াল রাখি। অন্যত্র তিনি বলেছেন, আমার বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোন দ্বীনি কিতাব অজু ছাড়া পাঠ করি নি।

টীকাঃ অর্থ অধম, খাদেম, সেবক ইত্যাদি।

যে পাতায় যা আছে

হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মেরী (র.) কিতাবকে কি পরিমান ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত ক্বারী তৈয়্যব সাহেব (র.) বলেন, আমরা হযরত শাহ সাহেব (র.)কে সফরে বা বাড়িতে অবস্থান কালে কোন সময়েই শুয়ে শুয়ে কিতাব পড়তে দেখি নি। কিতাব সামনে রেখে এমন আদবের সাথে বসে পড়তে দেখিছি যেন কোন শাইখের সামনে বসে তার নিকট হতে পাঠ নিচ্ছেন।

(হায়াতে আনোয়ার ঃ ২৩৩)

৪
৩৯

পড়াশুনায় একাগ্রতা

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (র.) এর জ্ঞানচর্চা ও পড়াশুনায় একাগ্রতা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ২৪ ঘন্টার মধ্যে আহার ও বিশ্রামের সাত আট ঘন্টা ব্যতীত বাকি সময়টুকু কিতাব দেখায় ব্যয় করতেন। তিনি পড়াশুনায় এতই নিবিষ্ট থাকতেন যে, তার পাশে রাখা খাবার যদি কেউ উঠিয়ে নিয়ে যেত তাহলে তিনি টেরও পেতেন না। অনেক সময় তিনি কিতাব দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়তেন, রাতের খাবারের কথা ভুলে যেতেন। একবার পড়াশুনায় নিমগ্নতা সংক্রান্ত একটি ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

আমি হযরত শাহ আব্দুল গণি (র.) এর নিকট পড়তে যেতাম। তার বাড়ির অনতিদূরে আমার খাবারের ব্যবস্থা ছিল। খাওয়ার সময় হলে আমি সেখান থেকে খেয়ে আসতাম।

যেখানে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল সেখানে আসা যাওয়ার পথে এক মজযুব১ থাকত। একদিন সে আমাকে বলল, মৌলভী! তুমি প্রতিদিন এ পথে কোথায় যাও? অন্য কোন পথ নেই?

আমি বললাম, খাবার খেতে যাই। অন্য রাস্তাটি যেহেতু বাজারের ভিতর দিয়ে গিয়েছে এবং সেখানে সব রকমের জিনিসপত্রের প্রতি নজর পড়তে পারে, এজন্য আমি এ পথে আসা যাওয়া করি।

মজযুব বলল, মনে হয় তোমার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। খাওয়া পরার কষ্ট আছে। আমি তোমাকে স্বর্ণ তৈরির ফর্মূলা শিখিয়ে দেব। এক সময় এসে ফর্মূলাটি শিখে নিও।

মজযুবের কথা শেষ হওয়ার পর আমি 'আচ্ছা আসব' বলে বিদায় নিলাম। কিন্তু সেখান থেকে আসার পর পড়াশুনায় নিমগ্নতার কারণে সেকথা বেমালুম

www.smfoundationbd.com

ভুলে গেলাম। পরের দিন মজযুব আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল। আমি বললাম, লেখাপড়ার কারণে সময় পাই না। জুমআর দিন সময় করে আসব।

জুমআর দিন এলে সেদিনও পড়াশুনার ব্যস্ততার কারণে যাওয়ার কথা ভুলে গেলাম। আবার মজযুবের সাথে দেখা হল। সে বলল, তুমি তো কথা মত এলে না। আমি ভুলে যাওয়ার কথা বললাম এবং আগামী জুমআয় আসার ওয়াদা করলাম। কিন্তু পড়াশুনায় অত্যধিক পরিমাণে মগ্ন থাকার কারণে সেদিনও যাওয়া হল না। এভাবে কয়েক জুমআ কেটে গেল।

অবশেষে এক জুমআর দিনে সেই মজযুব নিজেই আমার কাছে এলেন এবং হযরত শাহ নিজামুদ্দীনের দরগাহের দিকে আমাকে নিয়ে গিয়ে এক ধরনের ঘাস দেখালেন। সাথে সাথে সেই সব স্থানের কথা বলে দিলেন, যেখানে এই ঘাস হয়। তারপর সেই ঘাস নিজেই ছিড়ে এনে আমাকে শিখানোর জন্য আমার সামনেই একটি বিশেষ নিয়মে স্বর্ণ তৈরি করলেন। অতঃপর স্বর্ণের টুকরাটি আমার হাতে দিয়ে বললেন- যাও, এটি বাজারে বিক্রি করে প্রয়োজন মিটাবে। একথা বলে তিনি চলে গেলেন।

আমি স্বর্ণের টুকরাটি সাথে নিয়ে চলে এলাম। কিন্তু পড়াশুনায় নিমগ্নতার ফলে আমার এতটুকু অবকাশ ছিল না যে, আমি বাজারে গিয়ে স্বর্ণটুকু বিক্রি করব। অবশেষে অনেক দিন পর মজযুব একদিন নিজে বাজারে গিয়ে সেই স্বর্ণ বিক্রি করে পয়সা এনে আমাকে দিলেন।

প্রিয় পাঠক! এ ঘটনা দ্বারা একদিকে যেমন পড়াশুনার দিকে হযরত গঙ্গুহী (র.) এর প্রচণ্ড ঝোঁক বুঝা যায়, তেমনি দুনিয়া ও দুনিয়ার অর্থ সম্পদের প্রতি তিনি কতটা নিস্পৃহ ছিলেন তাও অনুমান করা যায়।

[সময়ের মূল্য ও জীবন সাধনা ঃ ১১০]

(বিঃদ্রঃ এই মনীষীর আরেকটি ঘটনা দেখুন সিরিজ-১১ঃ৮৯)

৫

৪০

নম্রতা ও অঙ্গীকার পালনের বিরল দৃষ্টান্ত

হযরত থানভী (র.) 'খানে খলীল' নামক গ্রন্থে লিখেন- একদা আমি সাহারানপুরের মাজাহেরে উলূম মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে উপস্থিত হলাম। মাহফিল শেষ হওয়ার পর এলাকার লোকজন হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীর সাথে আমাকেও দাওয়াত করল। হযরত সাহারানপুরীর খাদেমরাও এ

যে পাতায় যা আছে

দাওয়াত থেকে বাদ পড়ল না। পরের দিন সাহারানপুরের এক চাউল ব্যবসায়ী আমাদের সবাইকে খানা খাওয়ার দাওয়াত দিল। হযরত সাহারানপুরী (র.) দাওয়াত কবুল করলেন এবং বললেন যে, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল সকালে গ্রাম থেকে ফিরে এসে দুপুরের খাবার তোমার ওখানে খাব।

ঐ দিন সন্ধ্যায় হযরত নিজ গ্রামে চলে গেলেন এবং ওখানেই রাত্রি যাপন করলেন। পরদিন সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে যখন রেল স্টেশনে পৌঁছলেন তখন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। তাই স্থানীয় লোকজন সে সময় সফর করাকে একদম অপছন্দ করল এবং হযরতকে সেখানেই অবস্থানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাল।

হযরত বললেন, এখন যদি না যাই তাহলে ব্যবসায়ীর সাথে আমার ওয়াদা ভঙ্গ হবে। সুতরাং যে কোন উপায়ে সেখানে পৌঁছতেই হবে। এ বলে তিনি বৃষ্টিতে ভিজে ট্রেনে চড়লেন এবং সাহারানপুর এসে অবতরণ করলেন।

হযরতের ইচ্ছা হল, প্রথমে মাদরাসায় যাবেন তারপর ওয়াদা পালনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবসায়ীর বাড়িতে হাজির হবেন। হযরত তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী টাঙ্গায়[১] করে মাদরাসায় আসছিলেন। পথিমধ্যে দাওয়াত প্রদানকারী ব্যবসায়ীর সাথে দেখা হল। সে বলল হযরত! আমি তো ভেবেছি, এই বৃষ্টির দিনে আপনারা আসবেন না। তাই খানাপিনার কোন আয়োজন করিনি। যাহোক আগামীকাল সকালে আপনাদের দাওয়াত থাকল। লোকটির কথায় আমার প্রচন্ড রাগ এসে গেল। কিন্তু আদবের দিকে লক্ষ্য করে আমি তা প্রকাশ করতে পারছিলাম না। অথচ তখন হযরত সাহারানপুরী (র.) এর বিনয় নম্রতা ও ভদ্রতা ছিল দেখার মত। তিনি লোকটির কথা নির্দ্বিধায় মেনে নিলেন এবং নিজের পক্ষ থেকে সেদিনের জন্য সকল মেহমানদের খাবারের ব্যবস্থা করলেন।

পরের দিন আমি দাওয়াতে যেতে অস্বীকৃতি জানালাম। গোস্বাই ছিল এর মূল কারণ। কিন্তু মূল কারণটি না বলে অন্যান্য কারণগুলো উল্লেখ করলাম। বললাম, হযরত! সকালের দিকে আমার তেমন ক্ষিধে লাগে না। আর দেরীতে আসলে কোন ট্রেন পাওয়া যাবে না। এদিকে আগামীকাল আমাকে বাড়িও ফিরতে হবে।

আমার কথার জবাবে হযরত শুধু এতটুকু বললেন যে, দাওয়াতে শরিক হয়ে যেয়ো। সেখানে যাওয়ার পর মনে চাইলে খাবে অন্যথায় তোমার উপর কোন জোর জবরদস্তি করা হবে না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বাঁচা সম্ভব হল না।

সকালে সবাই ব্যবসায়ীর বাড়িতে হাজির হলাম। খাবার আনা হল। আমিও বসলাম কিন্তু খেতে মন চাইল না। এর প্রথম কারণ গোস্বা আর দ্বিতীয় কারণ অভ্যাসের পরিপন্থি হওয়া।

টীকা ঃ ১. ঘোড়া চালিত এক প্রকার বাহন।

www.smfoundationbd.com

কিছুক্ষণ পর আমি অনুমতি নিয়ে বাইরে এলাম এবং ব্যবসায়ী মেজবানকে ডেকে আনলাম। তাকে আমি এহেন আচরণ সংক্রান্ত বেশ কিছু কথা বললাম এবং সবশেষে তওবা করালাম।

এ ঘটনা উল্লেখ করে হযরত থানভী (র.) বলেন, আলোচ্য ঘটনায় হযরত সাহারানপুরী (র.)যে ভদ্রতা ও নম্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা একেবারেই স্পষ্ট। তাঁর ভদ্রতা ও নম্রতার স্তর এতই উঁচু ছিল যে, আমার পক্ষেও তাঁর সঙ্গ দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

এদিকে শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র.) এ ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, উল্লেখিত ঘটনায় হযরত থানভী (র.)ও কম বিনয়-নম্রতার পরিচয় দেননি। কেননা প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি কেবল হযরতের কথায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে গেছেন এবং সকলের সামনে তাকে কিছু না বলে নির্জনে নিয়ে বলেছেন, যাতে সে লজ্জা না পায় এবং আলেমদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হয় তাও শিখে নেয়।

[খানে খলীল, আপবিতি, আকাবির কা তাকওয়া]

(এ বুযুর্গের আরেকটি ঘটনা দেখুন সিরিজ-১১ ঃ ৯৪)

৬
৪১

সমসাময়িকদের প্রতি শ্রদ্ধা

মল্লিক এরশাদ আহমাদ চাঁদপুরীর বর্ণনা। তিনি বলেন, তখন ভারতে নির্বাচনের প্রচারাভিযান চলছিল। আমি বিভিন্ন সভায় যেতাম। একদিন আমি থানভী (র.) এর এক মুরীদ[১] কে উদ্দেশ্য করে বললাম, ভাই! আমাদের সঙ্গে তোমাদের কোন তুলনাই হয় না। তোমাদের পীর বসে আছেন খানকার কোণে, আর আমাদের পীর হযরত মাদানী হলেন বীর মুজাহিদ। তিনি মাঠে নেমে কাজ করছেন। বিপদ-আপদের কোনই পরওয়া করেন না।

আমি কথাটা অবশ্য অবজ্ঞার উদ্দেশ্যে বলিনি। মুখে এল, আর অমনিই বলে ফেললাম। তবে বলার ঢংটা অবজ্ঞামূলকই ছিল। অথবা বলা যায়, এর পিছনে কিছুটা অবজ্ঞামূলক মনোভাবই কার্যকর ছিল।

এ সংবাদ হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (র.)এর কানে গেল। এ সময় তিনি মুরাদাবাদে অবস্থান করছিলেন। তিনি কথাটি শুনে এতটাই ক্রোধান্বিত হলেন যে,

টীকা ঃ ১. ছাত্র, শাগরেদ, শিষ্য ইত্যাদি।

আমাকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দিলেন এবং কঠিন কণ্ঠে বললেন, যাও, এক্ষুণি থানভী (র.) এর দরবারে হাজির হয়ে ক্ষমা চেয়ে আস। হযরতের ক্ষমা না নিয়ে আমার কাছে আর এসো না। তোমার এ মুখ আমি দেখতে চাই না।

অগত্যা তখনই আমি থানাভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সেখানে উপস্থিত হয়ে হযরত থানভী (র.) কে পূর্ণ ঘটনার বিবরণ শুনালাম।

থানভী (র.) বললেন, ভাই! এতে দোষের কি আছে। তুমি তো ঠিক কথাই বলেছ। তুমি যদি অন্যায় কিছু করে থাক তবে আমি তা ক্ষমা করে দিলাম। একথা বলে তিনি একটি ক্ষমাপত্র লিখে দিলেন। ফিরে এসে এই ক্ষমাপত্র হযরত মাদানী (র.) এর হাতে দিলে আমাকে পুনরায় মজলিসে বসার অনুমতি দেন।

[আমরা যাদের উত্তরসূরী ঃ ১১৫]

(বিঃদ্রঃ হযরত মাদানী (র.) এর আরও কয়েকটি ঘটনার জন্য দেখুন সিরিজ-১১ঃ৮৮, ৯০ ও সিরিজ-১২ঃ৯২, ৯৫)

৭
৪২

মুজাহিদ বেশে মাওলানা নানুতবী (র.)

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (র.) এর চলাফেরা ছিল নিতান্তই সাধারণ। কিন্তু বাতিলের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। জীবনের এক পর্যায়ে তিনি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তরবারী হাতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যুদ্ধ বিদ্যার পুথিগত চর্চা না থাকলেও রণাঙ্গণে তাঁর হাতিয়ার চালনা ও বন্দুক ব্যবহারের দক্ষতা প্রমাণ করে যে, তিনি একজন খাঁটি মুজাহিদ ও সেনাবাহিনীর যোগ্য কমান্ডার। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (র.) লিখেছেন-

১৮৫৭ সালের কথা। তখন অস্ত্র ছাড়া পথ চলা কঠিন ছিল। ফলে বাধ্য হয়ে আমরা রাইফেল চালনা শিক্ষা করতাম।

একদিনের ঘটনা। হযরত কাসেম নানুতবী (র.) নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। তখন আমরা রাইফেল চালনার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম। মাওলানা এসে বললেন- দেখি, তোমরা কিভাবে রাইফেল চালাও। তখন আমাদের একজন একটি ফায়ার করে লক্ষ্যস্থলে নিশানা করার নিয়ম শিখিয়ে দিল। এবার তিনি রাইফেল নিয়ে ফায়ার করলেন। অব্যর্থ নিশানা। গুলি গিয়ে ঠিক লক্ষ্যস্থলে আঘাত হানে।

একটুও এদিক সেদিক হয়নি। ব্যাস, আর কোন দিন তিনি রাইফেল চালনা চর্চা করেননি। একদিনের চালনায় এই যে শিখলেন, আর কোন দিন তা ভুলেন নি। যুদ্ধ বিদ্যার এ দক্ষতার কারণেই বৃটিশ বিরোধী লড়াইয়ে তাকে থানাভবন ও শামেলীর যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল।

মাওলানা আরো বলেন যে, ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের সময় যখন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে গ্রেফতার অভিযান শুরু হয়, তিনি তখন মাত্র তিন দিন লুকিয়ে থেকে তারপর প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসেন। তিনি বলেন, তিন দিনের বেশি আত্মগোপন করে থাকা সুন্নত পরিপন্থি। একবার তিনি অনুসন্ধানকারী সিপাহীদের সামনে পড়ে যান। তারা নানুতবী (র.)কে চিনত না। জিজ্ঞেস করল, মাওলানা কাসেম কোথায় বলতে পারেন? মাওলানা কৌশল খাটিয়ে দু পা সরে গিয়ে বললেন, এই তো একটু আগেই তিনি এখানে ছিলেন। এভাইে তিনি সিপাহীদেরকে বোকা বানিয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে আত্মরক্ষা করেন।

(মাওলানার আরও দুটি ঘটনার দেখুন সিরিজ-১১ ঃ ৯১, সিরিজ-১২ ঃ৮১)

[আমরা যাদের উত্তর সূরী ঃ ৩০]

৮

৪৩

ঔষধের স্থলে বিষ

একবার হযরত শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী (র.) বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সংবাদ পেয়ে চিকিৎসক এলেন। পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন। উক্ত চিকিৎসক চিকিৎসা বিদ্যায় তেমন পারদর্শী ছিলেন না। তিনি ভুলক্রমে হযরতকে ঔষধের পরিবর্তে বিষপান করতে দিলেন। তা পান করার সাথে সাথে হযরতের বমি হল এবং সঙ্গে সঙ্গে অসুখ বেড়ে গেল। পরে ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেল যে, কয়েক মিনিটের মধ্যে বমি না হলে প্রাণে বেঁচে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ত। এ ঘটনায় হাকীম সাহেব ঐসব লোকদের চক্ষুশূলে পরিণত হলেন যাদের সাথে হযরতের সামান্যতমও মহব্বত ছিল। শুধু তাই নয়, তারা তার চেহারা দেখতেও রাজি ছিল না। অথচ হযরতের জন্য হাকীম সাহেবের অনুতাপ এবং তার ব্যাপারে ভক্তদের রোষাণল একটা স্বতন্ত্র ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ হযরত চাচ্ছিলেন যে, এ কারণে ভক্তবৃন্দরা হাকীম সাহেবের উপর নারাজ না হোক এবং হাকীম সাহেবও এজন্য কোন আফসোস অনুতাপ না করুক। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যা কিছু হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে। অতএব এ ব্যাপারে অন্যকে দোষারোপ করার কোন মানে নেই। হযরতের এ

মনোভাব থাকার কারণে যখনই হাকীম সাহেব তাঁর নিকট আসতেন তখনই তাকে ডেকে এনে একেবারে নিজের কাছে বসাতেন। এমনকি কোন নতুন ঔষধ ব্যবহার করতে চাইলে হাকীম সাহেবের সাথে পরামর্শ করতেন। তার পরামর্শ গ্রহণযোগ্য হলে সেই মতে কাজ করতেন। অন্যথায় তার সাথে এমন কথা বলতেন যাতে তার মনে এ কথার বিশ্বাস জন্মে যে, হযরত আমার চিকিৎসায় আস্থাশীল এবং আমার অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতায় সন্তুষ্ট। এসব ছাড়াও একবার তিনি বিশিষ্ট খাদিমদের ডেকে এনে বলেছিলেন, হাকীম সাহেব তো আমার শুভাকাঙ্খী। ভুল তো মানুষ মাত্রই হয়ে থাকে। তিনি যা করেছেন তা আমার প্রতি মহব্বত ও দরদবশতঃই করেছেন। কাজেই কেউ তাকে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখলে আমার অন্তরে প্রচন্ড আঘাত লাগে। মনে রেখ, একমাত্র আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কেউই পরিপূর্ণভাবে স্বেচ্ছায় কোন কাজ করতে পারে না। অতএব যা কিছু হয়েছে তাঁরই ইচ্ছায় হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উপায় উপকরণকে দোষারোপ করার অধিকার কারো নেই।

[তাযকিরাতুল খলীল, মাওলানা আশেক ইলাহী মিরাঠী (র.)]

(বিঃদ্রঃ এ হযরতের আরো ২টি ঘটনা দেখুন সিরিজ-১১ ঃ ১০৪, সিরিজ-১২ ঃ ৯৩)

৯
৪৪

খেদমতের অনন্য দৃষ্টান্ত

একবার হযরত মাওলানা মোজাফফর হোসাইন কান্দলভী (র.) কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হল, যার সাথে অনেক মাল পত্র ছিল। মাওলানা তাকে জিজ্ঞেস করলেন- জনাব! কোথায় যাবেন? লোকটি বলল, কান্ধালায় মাওলানা মুজাফফর হুসাইন সাহেবের নিকট যাব। হযরত খালি হাতে ছিলেন। তিনি লোকটির বড় একটি বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিলেন। কান্ধালায় পৌঁছে লোকটি যখন জানতে পারল, যাকে দিয়ে তিনি বোঝা বহন করিয়েছেন তিনিই মাওলানা মুজাফফর হুসাইন, তখন সে খুব লজ্জিত হল। হযরত তার লজ্জা দূর করার জন্য বললেন, ভাই! এতে দোষের কি হল? আপনি আমার মেহমান। মেহমানের খেদমত করতে কোন অসুবিধা নেই। তদুপরি আমার হাত খালি ছিল। আর আপনার কাছে ছিল অনেক বোঝা।

[আকাবির কা তাকওয়া]

(উক্ত বুযুর্গের আরো ৪টি ঘটনা দেখুন, সিরিজ-১১ ঃ ৯৫/১০০, সিরিজ-১২ ঃ ৭৭/৭৮)

১০
৪৫

একেই বলে পরহেযগারী

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) এর ঘটনা। একবার তিনি কোন এক সফরে একটি ছোট রেল ষ্টেশনে এসে পৌঁছলেন। প্রচন্ড বৃষ্টির দরুণ বাইরে দাঁড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। ব্যাপারটি ষ্টেশন মাষ্টারের নজরে পড়ল। তিনি হযরতকে রেলওয়ের একটি গুদামে বসার ব্যবস্থা করে দিলেন।

হযরত থানভী (র.) দীর্ঘক্ষণ যাবত অপেক্ষা করছেন। বাইরে এখনো বৃষ্টি পড়ছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। অন্ধকারে চারিদিকে ছেয়ে গেল। গুদামেও চলে এল ঘুটঘুটে অন্ধকার। স্টেশন মাষ্টার এক কর্মচারীকে ডাকলেন। বললেন, গুদামে একটি হারিকেন জ্বালিয়ে দাও।

হযরত থানভী (র.) চিন্তিত হলেন। ভাবলেন, কর্মচারী আবার ষ্টেশনের হারিকেন নিয়ে আসবে না তো? একবার মনে হল, কর্মচারীকে ডেকে বলে দেই- ভাই! আমাদের জন্য স্টেশনের হারিকেন আনবেন না। কারণ এটি সরকারি সম্পদ। আর সরকারি সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করলেন, এ বেচারা হিন্দু লোক। সে হয়তো মনে মনে ভাববে, ইসলাম ধর্মে এত সংকীর্ণতা? এত কঠিন এর নিয়ম-নীতি?

এ চিন্তা করে হযরত থানভী (র.) আন্তরিকভাবে দু'আ করতে লাগলেন। অনুচ্চ স্বরে বললেন, হে পরওয়ার দিগার! আপনি আমাকে এ সংকট থেকে উদ্ধার করুন। হেফাজত করুন এ অন্যায় থেকে।

আল্লাহ পাক আমার দুআ কবুল করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুনা গেল, ষ্টেশন মাষ্টার ঐ কর্মচারীকে ডেকে বলছেন- দেখ, ষ্টেশনের হারিকেন যেন আনা না হয়। আমার ব্যক্তিগত হারিকেনটি জ্বালিয়ে দাও।

হযরত থানভী (র.) আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলেন এবং বললেন, ষ্টেশনের হারিকেন হলে অন্ধকারে বসে থাকতাম, তবুও তা জ্বলতে দিতাম না।

[আকাবির কা তাকওয়া]

(বিঃ দ্রঃ হযরত থানভী (র.) এর আরো দুটি ঘটনা পাবেন সিরিজ-১১ঃ৯৬, সিরিজ -১২ঃ৯৪)

১১

৪৬

আমল পরিবর্তনের অনুপম পদ্ধতি

মিরাঠের এক ছাপাখানা। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (র.) এক সময় এতে চাকুরী করতেন। তখন তার সাথে একজন হাফেজ সাহেবও সেখানে চাকুরি করত। দীর্ঘদিন চাকুরি করার ফলে উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

হাফেজ সাহেব ছিল স্বাধীন প্রকৃতির লোক। তার আচার ব্যবহার সুন্দর হলেও ইসলামি বিধি-বিধান পালনে মোটেও সে যত্নবান ছিল না। দাড়ি ছাঁটত, নামাজ কাযা করে দিত, টাইট ফিট পায়জামা পড়ত। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও হযরত নানুতবী (র.) তার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করেননি।

তারা দুই বন্ধু একে অপরকে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করতেন। গোসলের সময় শরীর মর্দন করে দিতেন। মাথায় তৈল লাগিয়ে সুন্দর করে আঁচড়িয়ে দিতেন। হযরতের নিকট কোন খাবার এলে হাফেজ সাহেবের জন্য অবশ্যই একটি অংশ রেখে দিতেন। তার জন্য কিছু না রেখে একা একা সবটুকু খেয়ে ফেলতেন না। মোটকথা তাদের বন্ধুত্ব ছিল খুবই গাঢ়।

হযরতের অন্যান্য বন্ধুরা এ ব্যাপারটি মেনে নিতে পারতেন না। তারা একথা ভেবে হযরতের উপর খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন যে, এমন আযাদ প্রকৃতির লোকের সাথে কেন তিনি বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন? তার মত একজন মহান ব্যক্তির পক্ষে এমন কাজ কি শোভা পায়?

কিন্তু হযরত নানুতবী (র.) ছিলেন অন্য রকম মানুষ। বন্ধুদের এরূপ মনোভাবের কথা ভাল করেই তিনি জানতেন। কিন্তু এসবের কোন পরওয়াই করতেন না। আর কেনইবা পরওয়া করবেন? তিনি তো এক বৃহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এমন স্বাধীনচেতা লোকের সাথে বন্ধুত্ব পেতেছেন।

এক শুক্রবারের ঘটনা। পূর্বের নিয়মানুযায়ী একে অপরকে গোসল করালেন। গোসলের পর হযরত নানুতবী (র.) হাফেজ সাহেবকে সম্বোধন করে হেকমতের সাথে বললেন-

ভাই হাফেজ সাহেব! তোমার সাথে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। কাজেই এটা ভাল দেখা যায় না যে, তোমার চাল-চলন, আকৃতি প্রকৃতি এক রকম হবে, আর আমার

চাল-চলন ও আকৃতি-প্রকৃতি ভিন্ন রকম হবে। সুতরাং এটাই সুন্দর হবে যে, আমিও তোমারই মত বেশ ভূষা ধারণ করব। তোমার মতই চলাফেরা করব। যাও, তোমার কাপড়গুলো নিয়ে এস, আমি তা পরিধান করব। আর আমার দাড়িগুলোও ছেঁটে তোমার মত ছোট করে দাও। আমি তোমার সাথে অঙ্গীকার করছি যে, এ কাপড় কখনো পরিত্যাগ করব না এবং দাড়িও লম্বা হতে দেব না।

হযরতের এ কথাগুলো হাফেজ সাহেবের অন্তরে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হযরত এটা কেমন করে সম্ভব? বরং আপনিই আমাকে আপনার কাপড়গুলো দিন। আমি আপনার কাপড়ই পড়ব। আজ থেকে দাড়িও লম্বা করব। সুতরাং সেদিন থেকে ঐ হাফেজ সাহেব পাক্কা নামাজী এবং নেক আকৃতি প্রকৃতির হয়ে গেল।

[আরওয়াহে ছালাছা ঃ ১৭৪]

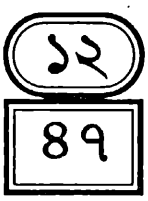

হালাল খাদ্যের প্রভাব

শাহ্ আব্দুল্লাহ্ নামে এক ব্যক্তি দেওবন্দে বাস করত। তার পেশা ছিল, ঘাস কেটে বাজারে বিক্রি করা। এটাই ছিল তার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়। লোকটি বেশ গরিব হলেও একটি কাজ নিয়মিত সে করত। ঘাস বিক্রি করে যে মূল্য পেত, উহাকে সে তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ মাকে দিত, এক ভাগ নিজ প্রয়োজনে খরচ করত, আর বাকি এক ভাগ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিত। এভাবেই চলছিল শাহ্ আব্দুল্লাহর প্রাত্যাহিক জীবন।

একদিন তার মনে একটি সাধ জাগল। ভাবল, প্রতিদিন তো উপার্জনের তিন ভাগের এক ভাগ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেই। আগামী কাল দান না করে তা দিয়ে কয়েকজন আলেমকে খানা খাওয়াব।

সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে সে মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (র.) এবং তার কয়েকজন সাথীকে দাওয়াত করতে গেল। মাওলানা পূর্ব থেকেই লোকটির অবস্থা অবহিত ছিলেন। তাকে মহব্বতও করতেন। তাই তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এত লোককে দাওয়াত দিচ্ছ, খাওয়াবে কি?

জবাবে লোকটি বলল, আমি যে অংশ দান করি তা দিয়ে আমন্ত্রিত মেহমানদের মেহমানদারী করব। তবে আমার নিজের যেহেতু রান্না করার কেউ

নেই। তাই আপনাদের নিজেদেরকেই রান্না করে খেয়ে আসতে হবে। হযরত 'ঠিক আছে' বলে লোকটিকে বিদায় দিলেন।

পরদিন মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (র.) তার সাথীদের নিয়ে শাহ আব্দুল্লাহর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। শাহ আব্দুল্লাহ মাওলানার হাতে পাঁচটি পয়সা উঠিয়ে দিয়ে বলল- এই নিন। আপনারা এ দিয়ে যা করার করুন।

মেহমান অনেক। পয়সা মাত্র পাঁচটি। মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (র.) এ ব্যাপারে সাথীদের সাথে পরামর্শ করলেন। সিদ্ধান্ত হল, সামান্য গুড় ও চাউল কিনে তা দিয়ে ক্ষীর পাকানো হবে।

পরামর্শ অনুযায়ী গুড় ও চাউল কিনে একজন বাবুর্চিকে বলা হল, তুমি অজু করে পাক পবিত্র হয়ে এ দিয়ে ক্ষীর রান্না করবে। বাবুর্চি তাই করল। রান্না শেষ হওয়ার পর প্রত্যেকেই দু' লুকমা করে খেয়ে নিয়ে যার যার বাড়িতে ফিরে এলেন।

হালাল উপার্জন দ্বারা তৈরিকৃত খাবার স্বল্প হলেও তাতে নূর এবং বরকত থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হল না। এজন্য মাওলানা ইয়াকুব (র.) প্রায়ই বলতেন, ঐ দিনের দু' গ্রাস খাবারের কারণে দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত আমার অন্তরে নূর ও বরকত অনুভব করেছি।

হযরত থানভী (র.) বলেন, যদি হালাল উপার্জনের এক দু' গ্রাসের প্রভাব এমন হয়, তবে যারা সব সময় হালাল খাবার ভক্ষণ করে তাদের অন্তরের অবস্থা কেমন হবে?

[ফাযায়েলে নিয়ত ঃ ১১১]

১৩
৪৮

বেতন গ্রহণে আপত্তি

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র.) ছিলেন শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র.) এর মুরশিদ[১]। যখন হযরত সাহারানপুরী (র.) বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং দুর্বলতার কারণে মাদরাসায় ক্লাস নিতে পারছিলেন না তখন তার পরিবর্তে শাইখুল হাদীস (র.) এর পিতা হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব (র.) দাওরায়ে হাদিসের সবক পড়াতেন। কিন্তু যখন হযরত ইয়াহইয়া সাহেব (র.) ইন্তেকাল করলেন তখন হযরত সাহারানপুরী (র.) একথা লিখে মাদরাসা থেকে বেতন দিতে অস্বীকৃতি জানালেন যে, আমি গত কয়েক বছর যাবত স্বীয় বার্ধক্য ও দুর্বলতার কারণে মাদরাসার কাজ ভালভাবে আঞ্জাম দিতে পারছি না। কিন্তু তবুও এতদিন তো মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে দাওরার

টীকা ঃ ১.পীর, শাইখ, মুরুব্বী

www.smfoundationbd.com

সবক পড়িয়ে দিতেন এবং সে জন্য তিনি বেতনও গ্রহণ করতেন না। তিনি এবং আমি মিলে একাধিক শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতাম। কিন্তু এখন যেহেতু তিনি ইন্তেকাল করেছেন এবং আমিও শিক্ষা প্রদানের কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে পারছি না, তাই আমি এখন বেতন নিতে সম্পূর্ণ অপারগ।

এ কথার জবাবে হযরত আব্দুর রহীম রায়পুরী (র.) লিখলেন, আপনার উপস্থিতি মাদরাসার জন্য একান্ত প্রয়োজন। আপনি উপস্থিত থাকলে মাদরাসার যাবতীয় কাজ সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হবে। অতএব মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এখন আপনাকে শিক্ষক হিসেবে বেতন প্রদান করবে না, বরং এর একজন পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আপনার মূল্যায়ন করবে। আপনি উপস্থিত না থাকলে মাদরাসার এত বেশি ক্ষতি হবে যা পূরণ করা সম্ভব নয়।

হযরত থানভী (র.) ও রায়পুরী (র.) এর এ বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন করলেন। ফলে সাহারানপুরী (র.) বেতন নিতে রাজি হলেন।

১৪
৪৯

বেতন বাড়াতেও অনীহা

উপরে বর্ণিত মনীষীরই আরেকটি ঘটনা। হযরত সাহারানপুরী (র.) এর বেতন ছিল মাত্র চল্লিশ টাকা। দীর্ঘ দিন যাবত এ বেতনেই তিনি দ্বীনের খেদমত পূর্ণরূপে আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সদস্যদের পক্ষ থেকে যখনই বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হত তখনই তিনি বলতেন- আমার যোগ্যতার তুলনায় এ বেতনই অনেক বেশি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন নিচের শিক্ষকদের বেতন চল্লিশে গিয়ে পৌঁছল তখন তারা এ যুক্তি দেখিয়ে হযরতকে রাজি করাতে চাইলেন যে, এখনও যদি আপনি বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে সম্মতি না দেন তাহলে নিচের উস্তাদগণের বেতন বাড়ানো সম্ভব হবে না। কারণ সাধারণ শিক্ষকদের বেতন তো প্রধান শিক্ষকের বেতনের চেয়ে বেশি হতে পারে না। অবশেষে তিনি অনন্যোপায় হয়ে স্বীয় বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি মেনে নেন।

প্রিয় পাঠক! পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে বেতন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন, অনশন, মিটিং-মিছিল ও বক্তৃতা-জনসভার আয়োজন চলে সেখানে এরূপ মুখলেছ ও নিষ্ঠাবান মানুষের খোঁজ পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের বিষয়। হায়! বিশ্বের সবাই যদি এমন হতো। হে আল্লাহ! আকাবিরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদেরকেও তুমি তাদের মত নির্লোভ অন্তরের অধিকারী হওয়ার তাওফীক দাও। আমীন।

[আকাবির কা তাকওয়া। ফুয়ুযে আকাবির ১ঃ১৫]

১৫
৫০

তাকওয়ার অনন্য দৃষ্টান্ত

দারুল উলূম দেওবন্দের এক কালের মুহতামিম ছিলেন হযরত মাওলানা মুনীর সাহেব (র.)একবার তিনি মাদরাসার বার্ষিক রিপোর্ট ও পরিচিতি ছাপানোর উদ্দেশ্যে আড়াইশত টাকা নিয়ে দিল্লী অভিমূখে রওয়ানা দেন। পথিমধ্যে ঘটনাক্রমে তাঁর পকেট থেকে সবগুলো টাকা চুরি হয়ে যায়। তাই তিনি সেদিনের মতো সফর মূলতবি করে সোজা বাড়ি চলে আসেন এবং কাউকে না জানিয়ে নিজস্ব এক খানা জমি বিক্রি করে পুনরায় আড়াইশত টাকা নিয়ে দিল্লী পৌঁছেন। অতঃপর পরিচিতি ও বার্ষিক রিপোর্ট ছাপিয়ে মাদরাসায় চলে আসেন। কিছুদিন পর মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত হন। তারা হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (র.) এর নিকট ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিখে পাঠান এবং এ ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম কি তাও জানতে চান।

উত্তরে গঙ্গোহী (র.) বলেন, যেহেতু মাওলানা মুনীর সাহেব উল্লেখিত টাকার আমীন বা রক্ষক ছিলেন আর টাকাটা তার কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে খোয়া গেছে, কাজেই এজন্য তিনি দায়ী নন এবং এর ক্ষতিপূরণও তাকে দিতে হবে না।

এ ফতোয়া প্রাপ্ত হওয়ার পর মাদরাসা কর্তৃপক্ষ মাওলানা মুনীর সাহেব (র.) এর খেদমতে হাজির হন এবং হযরত গঙ্গোহী (র.) এর ফতোয়া দেখিয়ে আড়াইশত টাকা ফেরত নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

মাওলানা সাহেব ফতোয়া দেখে বললেন, রশীদ আহমাদ কি ফতোয়া কেবল আমার জন্যেই পড়েছিল? এবং এই মাসআলা কি শুধু আমারই জন্য? সে নিজের বুকে হাত রেখে বলুক, যদি তার বেলায় এমন ঘটনা ঘটত তাহলে সে কি টাকা নিতে রাজি হত? যাও, এই ফতোয়া নিয়ে যাও। আমার পক্ষে একটি পয়সাও নেওয়া সম্ভব নয়।

[আরওয়াহে ছালাছা, আকাবির কা তাকওয়া।]

১৬
৫১

মাথায় যখন আমের বোঝা

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (র.) ছিলেন খুব সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী। দেখতে ঠিক রাজকুমারের মতোই মনে হত। তিনি সর্বদা উত্তম, পাতলা ও মোলায়েম পোষাক পরিধান করতেন। খুবই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন। নিম্নে তাঁরই একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

দেওবন্দ থেকে প্রায় তিন মাইল দূরের একটি গ্রাম। গ্রামটির নাম আমেলী। একদিন সেই গ্রামের এক লোক হযরতকে কয়েকজন ছাত্রসহ আম খাওয়ার দাওয়াত দিল। হযরত দাওয়াত কবুল করলেন।

দেওবন্দ থেকে আমেলী গ্রামের যাতায়াত ব্যবস্থা তখন ভাল ছিল না। লোকটি কোন বাহনও নিয়ে আসেনি। তাই বাধ্য হয়ে সবাইকে হেঁটেই যেতে হল। সেখানে পৌঁছার পর বাড়িওয়ালা আম দিয়ে খুব মেহমানদারী করল। এরপর যখন ফেরার পালা, তখন সে পর্যাপ্ত পরিমাণ আম হাজির করে বলল, আপনারা এগুলো বাড়ির জন্য নিয়ে যাবেন।

লোকটি ছিল বেশ সরল সোজা। সে তো আম হাজির করে বেশ খুশি। কিন্তু একবারও সে চিন্তা করে দেখল না যে, এত দূরের পথ, সাথে কোন যানবাহনও নেই, এমতাবস্থায় এতগুলো আম কিভাবে তারা বহন করে নিয়ে যাবেন? যদি সে বুদ্ধিমান হত তবে আম বহনের জন্য অবশ্যই একজন লেবার ঠিক করে দিত। হযরত যখন বুঝলেন যে, লোকটি সরল এবং আম না নিলে সে মনে ব্যথা পাবে তখন তিনি সাথীদেরকে যার যার অংশ নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। হযরতের নির্দেশে সকলেই যার যার অংশ কাপড়ে বেঁধে ফিরে চলল। বড় হুজুর হিসেবে হযরতের ভাগে আমের পরিমানটা ছিল তুলনামূলক অনেক বেশি। তিনিও তাঁর ভাগের আমগুলো একটি কাপড়ে বেঁধে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর কাঁধে যখন ব্যথা শুরু হল তখন তিনি কাঁধ বদলালেন। এ কাঁধে ব্যথা আরম্ভ হলে তিনি আবারো কাঁধ পরিবর্তন করলেন। দূরের পথ হওয়ার কারণে এভাবে বারবার কাঁধ পরিবর্তন করতে করতে এক পর্যায়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। অবশেষে বোঝাটি মাথায় তুলে নিলেন এবং বললেন মাথায় নেওয়ার বুদ্ধি আগে কেন আসে নি? অথচ অবস্থা

যে পাতায় যা আছে

এই ছিল যে, রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে তাঁকে সালাম করছে আর আমের গাট্টি মাথায় নিয়ে সহাস্যে তিনি সালামের জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এ অবস্থায়ও হযরতের চেহারায় সামান্যতম পরিবর্তন এল না। সুবহানাল্লাহ! এ কত বড় নম্রতা ও শিষ্টাচারিতা; একজন মানুষের হৃদয় কতটা অহংকার মুক্ত হলে এমনটি হওয়া সম্ভব। নফস বলতে কোন বস্তু যেন ছিলই না। আসলে তারাই হলেন প্রকৃত মানুষ যারা এত বড় ও মহান হয়েও নিজেকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারেন।

[হুসনুল আজীজ ৪ঃ২৪০]

১৭
৫২

শাইখের প্রতি বিরল সম্মান

শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র.) এর আব্বা হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব (র.) বলেন, যাকারিয়া আন্তরিকভাবেই তাঁর শাইখ ও উস্তাদদের আদব রক্ষা করে চলে। কথাটি অবশ্য বিশেষ একটি আচরণের দিকে ইঙ্গিত করেই তিনি বলেছেন।

মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব (র.) যে কক্ষে থাকতেন, উহার অবস্থান ছিল এমন এক জায়গায়, যেখান থেকে মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র.) এর কামরায় যেতে হলে ঐ কামরার ছাদের উপর দিয়ে হেঁটে আসতে হত। শাইখুল হাদীস (র.) পিতার কক্ষে বেশির ভাগ সময় থাকতেন। কিন্তু যখন আপন শায়েখ সাহারানপুরী (র.) এর নিকট গমনের প্রয়োজন হত, তখন তিনি সরাসরি ছাদের উপর দিয়ে না গিয়ে অনেক কষ্ট করে ছাদের কার্নিশ ধরে যেতেন। আর এ ব্যাপারটি পিতা ইয়াহইয়া (র.) বরাবরই লক্ষ্য করতেন।

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করার বিষয় যে, হযরত শাইখুল (র.) আপন শাইখের প্রতি কেমন ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন যে, শাইখের কামরার ছাদেও পা রাখতেন না। কারণ এ ছাদের নিচেই তো শায়খ অবস্থান করেন।

[আকাবির কা তাকওয়া]

www.smfoundationbd.com

১৮

৫৩

শাইখের প্রতি মনোযোগ

শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র.) এর আরেকটি ঘটনা।

হযরত সাহারানপুরী (র.) এর অভ্যাস ছিল প্রায়ই তিনি রুম ছেড়ে বাইরের বারান্দায় বসে আরাম করতেন। বারান্দার সামনে ছিল একটি প্রশস্ত আঙ্গিনা এবং আঙ্গিনার শেষ প্রান্তে দোতলায় ছিল কুতুবখানা। হযরত যাকারিয়া (র.) উক্ত কুতুবখানায় বসে কিতাব অধ্যায়ন করতেন।

হযরত সাহারানপুরী (র.) যখন স্বীয় শাগরেদ হযরত যাকারিয়া (র.)কে ডাকার প্রয়োজন মনে করতেন তখন দারোয়ানকে ডেকে আস্তে করে বলতেন যে, যাকারিয়াকে ডেকে নিয়ে এস। অনেক সময় এমন হত যে-আস্তে বলার দরুণ দারোয়ান পুরোপুরি শুনতে না পারায় পুনরায় জিজ্ঞেস করত, হুজুর! কি যেন বললেন? কিন্তু ততক্ষণে হযরত শাইখুল হাদীস (র.) বলে উঠতেন, হুজুর আমি আসছি। এ ঘটনা একবার দু'বার নয়, বহু বার ঘটেছে। হযরত শাইখুল হাদীস (র.) আপন শাইখের প্রতি কি পরিমান মনোযোগী ছিলেন। উল্লেখিত ঘটনা দ্বারা সহজেই তা অনুমান করা যায়।

[আকাবির কা তাকওয়া।]

সমাপ্ত

পাঠকের মতামত

সম্মানিত লেখক, আসসালামু আলাইকুম, আমি একজন কলেজ পড়ূয়া ছাত্রী। লেখাপড়ার শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমি আপনার হৃদয় গলে সিরিজের ১-১০ পর্যন্ত বইগুলো পড়েছি। আপনার বইগুলো আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। অবশ্য এর জন্য আমি অধিক কৃতজ্ঞ আমার আম্মুর নিকট। কেননা আম্মু যদি বইগুলো কিনে না দিতেন তবে কখনো বইগুলোর সন্ধান পেতাম না। হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছে অশ্রুভেজা কাহিনী-এর 'এরই নাম খাঁটি তওবা' ও 'নামাজে অলসতার ভয়াবহ পরিণাম'; যে গল্পে অশ্রু ঝরে-এর 'দ্বীনদারীর সঠিক মূল্যায়ন' ও 'সদাচরণের ফল'; যে গল্পে হৃদয় জুড়ে-এর 'আল্লাহর ওয়াদার প্রতি অবিচল আস্থা'। কেননা এই গল্পগুলো আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন এনেছে। আগে আমি নিয়মিত নামাজ পড়তাম ঠিকই কিন্তু অনেক সময় ঘুমের কারণে আছরের নামাজ কাযা হয়ে যেত, কিন্তু 'নামাজে অলসতার ভয়াবহ পরিণাম' পড়ে আমি খুব সচেতন হয়ে গেছি। 'এরই নাম খাঁটি তওবা' পড়ে আমি আমার দৃষ্টিকে সংযত করে ফেলেছি। আগে আমি যদিও পর্দা করে চলতাম তথাপি আমি আমার দৃষ্টির পর্দা করতে পারতাম না। কেননা পড়ানোর সময় স্যারদের দিকে তাকানো ছাত্র ছাত্রীদের স্বভাবজাত অভ্যাস। কিন্তু ইদানিং স্যারদের দিকে দৃষ্টি পড়লেও আমি আমার দৃষ্টি নিচু করে ফেলি। আমার অনেক বান্ধবীরা এই বইগুলো পড়ে নিয়মিত নামাজ ও পর্দা করা শুরু করে দিয়েছে। আমি মনে করি প্রত্যেক নর-নারী বিশেষ করে যুবক যুবতীদের এই বইগুলো পড়া উচিত। তাই আমি আমার অধীনস্থ সবাইকে এই বই পড়তে উৎসাহিত করেছি এবং এক প্রকার সফলও হয়েছি। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনার যে কোন বইয়ের শিরোনাম যেন আমার পাঠানো শিরোনাম থেকে বাছাই করা হয়, (১) যে গল্পে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যায় (২) যে গল্প জীবনে পরিবর্তন আনে (৩) যে গল্পে মুক্তি মিলে (৪) গল্প পড়ি জীবন গড়ি (৫) যে গল্প অনুসরণে আল্লাহকে পাওয়া যায় (৬) চলো গল্প পড়ে মানুষ হই (৭) যে গল্পে হৃদয় খুলে (৮) চলো গল্পে গল্পে আল্লাহর সন্ধান করি (৯) চলো গল্প পড়ে আদর্শ নারী হই। অবশেষে আপনার ও হৃদয় গলে সিরিজের দীর্ঘায়ু কামনা করে এখানেই শেষ করলাম।

মাকছুরা জাহান
পিতা ঃ জালাল আহমেদ
প্রযত্নে ঃ জি এস এ গালফ এয়ার
১০৭০ শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
ফোন ঃ ০১৮৯৩৭১৪৯৯

প্রিয় লেখক,

প্রথমে আমার ভক্তিপূর্ণ ছালাম রইল। সেই সাথে রইল বহু দূর থেকে স্বশ্রদ্ধ সম্মান ও ধন্যবাদ। পর সংবাদ এই যে, আমি বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণীর একজন ছাত্রী। সাধারণত ক্লাসের বই পড়া ব্যতীত অন্য কোন বই পড়ার সুযোগ আমার হয় না। আপনার হৃদয় গলে

সিরিজের কয়েকটি খণ্ড আমি পড়েছি। যখন যে গল্পে অশ্রু ঝড়ে বইটি পড়তে শুরু করি তখন মনের অজান্তেই গড়িয়ে পড়লো কয়েক ফোঁটা অশ্রুমালা। সত্যিই কিন্তু বইটি অশ্রু ঝড়াতে পারে। এ কয়েকটি খণ্ড পড়ে আমার জীবনে আমি পেয়েছি এক অসামান্য পরিবর্তন। এরপর বাকী খন্ডগুলো সংগ্রহ করে পড়ি। বইগুলো আমার হৃদয়ে প্রবল আকর্ষণ জাগায়। একটির পর একটি পড়তে বাধ্য করে। বইগুলো পড়ে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি। আপনার উপস্থাপনার ভঙ্গি অপূর্ব, তা আমি কিভাবে যে বোঝাবো ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আপনার বই পড়ে আমি আমার এ ক্ষুদ্র জীবনটাকে সুন্দর করে সাজানোর এক নতুন পথ খুঁজে পেয়েছি। বইগুলো পড়ে মনে হল এ জীবনে এমন হৃদয়বিদারক বই আর পাঠ করিনি। বর্তমানে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি। তওবা করেছি আর কোন দিন টিভি দেখবো না এবং সম্পূর্ণ রূপে পর্দা করে চলব। শুধু আমি নই আমার সবচেয়ে প্রিয় একটি মডেলিং বান্ধবীকে বইটি পড়তে দিলে তার অন্তরেও পড়ে যায় পরিবর্তনের এক অপূর্ব ছায়া। ভয় পেয়ে আমাকে বলে আর কখনো এভাবে বেপর্দায় চলব না। আমার বিশ্বাস, এ বইগুলো যদি প্রত্যেক তরুণ তরুণীদের হাতে পৌছানো যায় তাহলে তারা তাদের উচ্ছৃঙ্খল পথ থেকে ফিরে আসবে সভ্যতার দ্বারে। দু'আ করবেন যতদিন এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকব যেন একজন আদর্শ রমণী হয়ে থাকতে পারি এবং ইসলামের বিধিবিধানগুলো পরিপূর্ণভাবে মেনে চলতে পারি। আমি পরবর্তী খন্ডগুলোর জন্য অপেক্ষায় রইলাম। আল্লাহ আপনাকে নেক হায়াত দান করুন। আমীন।

মোসাঃ শারমিন আক্তার মদিনা
পুরান বাজার ডিগ্রি কলেজ
দ্বাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ, শাখা-ক, চাঁদপুর।

জনাব, আমি যদিও মাদরাসার ছাত্র কিন্তু কখনো ইসলামি সিরিজের কোন বই পড়িনি এবং পড়ার ব্যাপারে কখনো আগ্রহী হইনি। কারণ শয়তান সর্বদা আমাকে বাজে ও অশ্লীল বই পড়ার ব্যাপারে উৎসাহী করত। সুতরাং আমিও তাই করতাম। আমি কু দৃষ্টি থেকে মুক্ত হবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত না হতেই যা তাই। আমাদের এক সিনিয়র ভাই আমাকে 'যে গল্পে হৃদয় গলে' সিরিজের ১ ও ২নং সিরিজটি পড়তে দেন। যদিও প্রথমে তেমন ইচ্ছা হচ্ছিল না, তবুও মনকে অনেক বুঝিয়ে পড়ে শেষ করে ফেলি। কিন্তু আমার মাঝে কোন প্রকার পরিবর্তন না হওয়ার কারণে ভূমিকায় আপনার দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী পড়ি এবং ১, ২, ৮ ও ১১ নং সিরিজ পড়ে শেষ করি। এই কয়েকটি পড়ার কারণে আল হামদুলিল্লাহ আমার মাঝ থেকে কুদৃষ্টি দূর হয়ে গেছে। এই কারণে আপনাকে জানাই হাজার হাজার শুকরিয়া। আর হৃদয় গলে সিরিজের পাঠক-পাঠিকাদের বলছি আপনারা অন্যদেরকে হাদিয়া স্বরূপ সিরিজটি দিবেন। এতে তাদের অনেক উপকার হবে। ইনশাআল্লাহ।

মুহাঃ শরীফুজ্জামান
মাসনা মাদরাসা, মনিরামপুর, যশোর

চারিদিকে কুসংস্কার আর অপসংস্কৃতি, ঠিক এমনি সময় সকল কুসংস্কারের কবর রচনা করে উজ্জ্বল রবির ন্যায় উদিত হলো চরিত্রগঠনমূলক এক অনন্য সিরিজ।

শ্রদ্ধেয় লেখক, ছালামে মাসনূন বাদ, আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক মুবারকবাদ ও অভিনন্দন। আমি একজন ছাত্র এবং শিল্পী। বই পড়ার তেমন কোন অভ্যাস আমার নেই, অবসর সময়ে সঙ্গীত লেখা বা বিভিন্ন আলপনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। একদিন নীরবে বসে ইসলামি সঙ্গীতের ক্যাসেট শুনছিলাম। এমন সময় আমার বড় ভাই এসে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ক্যাসেট শুনবি কানে কিন্তু মুখে তো কিছু পড়তে পার। আমি বললাম, আমার কোন বই টই ভাল লাগে না। তিনি বললেন, না পড়ে কি স্বাদ পাওয়া যায়? এই বইটি পড়ে দেখ্ ভাল লাগে কিনা। আমি বইটি হাতে নিলাম, নামটা খুব পছন্দ হল। ভাবলাম, বইটিও সম্ভবত ভালই হবে। খুব মনোযোগ সহকারে পড়া শুরু করলাম। এক সময় পড়ার সাগরে ডুবে গেলাম, বাহিরের সকল ধ্যান ধারণা তখন বিলকুল আমার অন্তরে ছিল না। এরই মধ্যে ভাইয়া ডাক দিলেন, কিরে! ক্লাসে যাবি না? ভাইয়ার ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম। কখন যে ক্লাসের সময় হলো বলতেই পারলাম না। ভাইয়াকে বললাম, ভাইয়া! তোমার কাছে কি এই লেখকের আরো কোন বই আছে? তখন তিনি আমার সামনে আরো ৩টি বই হাজির করলেন। হৃদয় গলে ২য় ও ৩য় এবং সিরিজ-৪ অর্থাৎ যে গল্পে অশ্রু ঝড়ে। আমি ধারাবাহিকতাকেই প্রাধান্য দিলাম। অর্থাৎ যে গল্পে হৃদয় গলে ২য় খন্ড বেছে নিলাম। আর দেরী সহ্য হয়না। পড়ায় লেগে গেলাম। হঠাৎ নিজেকে একটু দুর্বল মনে হল। সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখলাম নিজের অজান্তেই চোখ থেকে দর দর করে পানি পড়ছে। তখন আমি 'মেয়েদের তো এমনই হওয়া চাই' এর শেষ প্রান্তে। এরপর শুরু করলাম, 'মাকে কষ্ট দেওয়ার নির্মম পরিণতি'। বেশি দূর যেতে পারিনি, কান্নায় যবান আটকে গেল, ছোট্ট শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সজোড়ে কাঁদছি। কোন ভাবেই কান্না নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছি না। অশ্রুফোঁটাকে অনেক দোহাইও দিয়েছি। কিন্তু কে শুনে কার কথা। সে নিজের মতই চলছে। আসলে চোখের পানি কি পরাধীন? না, ও স্বাধীন, ওকে কেউ জোড় করে আনতেও পারে না এবং বন্ধও করতে পারে না। এক সময় কিছু শান্ত হয়ে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। বই বন্ধ, মনটা কখন জানি কল্পনার অতল গহ্বরে চলে গেল। একটা সন্তান কি করে স্ত্রীর মায়ায় পড়ে আপন মায়ের সাথে এমন নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে? আজও এ গল্পটি আমাকে মাঝে মধ্যে ব্যথিত করে তুলে- মনের অজান্তেই বেরিয়ে আসে লেখকের বইগুলো অসীম প্রশংসার যোগ্য। এমন বই পড়লে আল্লাহর রহমতে যে কোন লোকের আমল পরিবর্তন হবেই ইনশাআল্লাহ। প্রতিটি গল্পই হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী। প্রত্যেকটি গল্পে রয়েছে একটি দিক নির্দেশনা, যা চরিত্রহীন মানুষকে চরিত্রবান বানাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ভাবলাম বইগুলো প্রত্যেক বন্ধু-বান্ধবের মাঝে বিতরণ করা দরকার। যেমন সিদ্ধান্ত তেমন কাজ, অনেককে পড়তে দেই বইগুলো। সকলেই কিছু না কিছু উপকৃত হয়েছেই। এমনকি অনেকে শপথও করেছে আর কখনো মা বাবার সাথে অসদাচারণ ও পরের হক নষ্ট করবে না। টিভি, বেপর্দা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে। তাই এর পর অনেককে আমি ইচ্ছা করেই পড়তে দেই বইগুলো। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যারা

বিভিন্ন আজে বাজে গল্প- উপন্যাসমূখী তাদের হাতের সাথে যদি হৃদয় গলে সিরিজের মুসাহাফা হয় তাহলে অবশ্যই সে কিছু না কিছু পরিবর্তন হবেই। আর হয়েছেও তাই। আমার স্থায়ী ঠিকানা কুয়াকাটা, পটুয়াখালী। আমি এখন চাঁদপুরে একটি মাদরাসায় তাফসীরে জালালাইন পড়ি। আমি সাধ্যানুসারে এখানকার সকলের কাছেই বইগুলো পৌঁছিয়েছি। ইরাদা করেছি আমার স্থায়ী ঠিকানায়ও পৌঁছাব। এর জন্য কামনা করছি আপনার একান্ত দুআ। দুআ করবেন আল্লাহপাক যেন ইখলাছের সাথে আমলের নিয়তে এবং হিদায়েতের উদ্দেশ্যে দ্বীনের খেদমত করার তৌফিক দান করেন এবং আরো বেশি আগ্রহ, মনোযোগ ও হিম্মত বাড়িয়ে দেন। আপনার হাজারো ত্যাগের বিনিময়ে প্রকাশিত হৃদয় গলে সিরিজ ধারাবাহিক ভাবে চালিয়ে যাবেন এ আশা আমাদের সকলের। আপনার এ ত্যাগ কিছুতেই বিফলে যাবে না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনার নেক হায়াত বাড়িয়ে দিন এবং শারীরিক সুস্থতা দান করে আরো বেশী দ্বীনের খেদমত করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মিছবাহ
(বিপ্লবী গিতীকার, সুরকার ও বিশিষ্ট ইসলামি গজল ও সংগীত শিল্পী)
প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, আলোড়ন শিল্পী গোষ্ঠী
চাঁদপুর। ফোন ঃ ০১৮৮২৩৮৩৬০, ০১৭৮৬২২৩৮২

আমার নাম রোকেয়া বেগম। তাই বলে আমি সাহিত্যিক রোকেয়া নই। আমি একজন গোনাহগার বান্দী। আমার মেয়ে আমাকে পর পর তিনটি বই দিয়েছে। হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলি পড়ে আমি এমন উপকৃত হয়েছি যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আপনার লেখা বইগুলি যে পড়তে পেরেছি, তাই আল্লাহ তা'আলার কাছে জানাই শুকরিয়া। সেই সাথে আপনার এই সুলেখার জন্য জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন ও আন্তরিক মোবারকবাদ।

দেখুন, আমি আগে যে ঘরে টিভি ছিল ঐ ঘরে যেতাম। মাঝে মাঝে একটু দেখতাম। কিন্তু আপনার বই পড়ে তওবা করে ফেলেছি যে, জীবনে কোনদিন টিভি দেখব না। যদিও কোন দিন কোন কারণবশতঃ যাই তখন টেলিভিশনকে পিছনে রেখে ইন্নালিল্লাহ পড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। আর কারো ঘরে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করি না। যেখানে বসি আপনার মূল্যবান বই থেকে গল্প বলে শুনাই। এতে অনেক মহিলারা সতর্ক হয়ে গেছে। আপনার বই যতই পড়ি মনের আবেগ ততই বাড়ে। তাই আমার অনুরোধ আপনি আরও লিখবেন। যেখানে আপনার লেখা শেষ সেখানেই আবার নতুন লেখা শুরু করবেন। কারণ লেখার মধ্যেই রয়েছে আপনার জীবনের বিরাট স্বার্থকতা। আপনার চেষ্টা ও সাধানার দ্বারা ছড়িয়ে পড়ুক আপনার ইসলামি জ্ঞানের প্রতিভা।

আপনি জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দেশ ও দশের খেদমতে নিজকে তিলে তিলে উৎসর্গ করে দিন। দেখবেন একদিন আপনি আধ্যাত্মিক জগতে চলে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আমি অধম বান্দী দোয়া করি তাই। আপনার মত লেখক বর্তমান জগতে খুবই জরুরি।

হে সত্য পথের আলোর সন্ধানী মাওলানা মোঃ মুফীজুল ইসলাম সাহেব। আপনি সাহাবায়ে কেরামের জীবনী থেকে হৃদয়বিদারক করুণ ঘটনাগুলি লিখবেন। আপনি ইসলামী জ্ঞান প্রসারিত করে মানুষের ঈমানকে আরো মজবুত করুন। দু'আ করি আপনার নামটা যেন আল্লাহর ওলীর দপ্তরে লেখা হয়। আপনার জীবন হউক স্বার্থক, সুন্দর, সুখময়। আল্লাহ যেন সবাইকে এই বইগুলি পড়ে ইসলামি জিন্দেগী গঠন করার তৌফিক দান করেন আমীন। ছুম্মা আমীন।

মোসাঃ রোকেয়া বেগম

প্রযত্নে মুহাম্মদ নূরুল আলম
গ্রাম ঃ দক্ষিণধুরু, চন্দনপুর, বেলাব, নরসিংদী।

আমি কওমী মাদরাসার মিজান জামাতে একজন ছাত্র। আমি ছোট বেলা থেকেই বই পড়ায় অভ্যস্থ ছিলাম। কিন্তু মাঝে বই পড়া একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে আমার বন্ধু হৃদয় গলে সিরিজের একটি বই দিল। তখন আমি একটি ঘটনা পড়লাম। পড়ার পড় দেখলাম আমার হৃদয় কেড়েছে। তার পর আমি আমার ভাবিকে দিলাম; আমার ভাবি পড়ে বলল, এমন বইই প্রয়োজন। আমি তার আগ্রহ দেখে ১ম খন্ড থেকে ১০ম খন্ড পর্যন্ত কিনলাম। বইগুলো পড়ে আমি ও আমার ভাবি অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করলাম। আমি আশা করি আপনার এই মূল্যবান বই পড়ে অনেক মানুষ খারাপ পথ থেকে ভাল পথে ফিরে আসবে। আল্লাহ পাক আপনার নেক হায়াত ও রিজিক বাড়িয়ে দিন। আমীন। ছুম্মা আমিন।

মুহাম্মদ শাহাদাত হুসাইন (সুলতান)
ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ।

শ্রদ্ধেয় লেখক, লিপির শুরুতে জানাই আমার আন্তরিক সালাম। আমি একজন গৃহিণী। বই পড়ার মত তেমন ধৈর্য ও আগ্রহ আমার ছিল না। হঠাৎ একদিন আমি আমার শ্বশুর বাড়িতে আসি। আমার প্রাণপ্রিয় বান্ধবী মদিনা আমাকে আপনার লিখা 'যে গল্পে হৃদয় কাড়ে' বইটা পড়তে দেয়। ধৈর্য না থাকা সত্ত্বেও বইটা পড়তে থাকি। তখন বইটির ভাষা আমার হৃদয়কে কেড়ে নিয়েছিল। তারপর একটির পর একটি পড়তে থাকি এবং সিরিজের সবকটি বই সংগ্রহ করে পড়ি। আপনার বইগুলো পাঠ করে আমি নিজে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। বই পড়া এখন আমার নিত্যদিনের সঙ্গী। তওবা করেছি ফিরে আসব, সকল ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের দ্বার প্রান্ত থেকে, চলে যাবো সত্য ও ন্যায়ের সন্ধানে। সত্যিই আপনার লেখার ভাষা অতুলনীয় প্রশংসার যোগ্যতা আমি কিভাবে যে বোঝাবো, ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমার জীবনে এ পরিবর্তনের জন্য আমি আপনার নিকট চির ঋণী হয়ে থাকলাম। আমার বিশ্বাস এই বইগুলো পড়ে আমার মত হাজারও গৃহিণীর জীবন সুন্দর হবে ইনশাআল্লাহ। উদ্বুদ্ধ হবে সত্যের পথে চলতে। আপনার নিকট আমার

অনুরোধ রইল, আপনি এভাবে লেখা চালিয়ে যাবেন। আল্লাহ আপনার নেক হায়াত বাড়িয়ে দিন এবং দ্বীনের খেদমত করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

ফেরদৌসী আলমগীর
প্রযত্নে ঃ মুহাম্মদ আলমগীর পাটওয়ারী
রঘুনাথপুর ওয়াপদা, বহরিয়া, চাঁদপুর।

মুহতারাম লেখক ভাইয়া! আমি কওমী মাদরাসায় পড়ুয়া একজন সাধারণ ছাত্র। ছোট বেলা থেকেই আমার সখ বই ক্রয় করা, বই পড়া, লাইব্রেরীতে ঘুরে ঘুরে মনের মত গ্রন্থগুলো অনুসন্ধান করা।

২০০৪ সালে লাইব্রেরীতে বেশ কিছুদিন ধরে আপনার অমূল্য গ্রন্থগুলো আমার দৃষ্টি গোচর হলো। এক পর্যায়ে প্রথম খন্ড কিনে পড়তে শুরু করলাম। এভাবে পালাক্রমে অধীর আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে এগার খন্ড পর্যন্ত অধ্যয়ন করতে সক্ষম হয়েছি।

সত্য বলতে কি বইগুলো আমাকে শুধু আনন্দই দেয়নি বরং আমাকে জীবন নিয়ে নতুন করে ভাবতে শেখালো, শেখালো চরিত্রবান মানুষ হতে, উদ্বুদ্ধ করলো বিভিন্ন প্রকার দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত হয়ে প্রয়োজনীয় মানবীয় ও প্রশংসনীয় গুণাবলির অধিকারী হতে, অনুপ্রাণীত করলো, মহীয়ষী মার চরণে মস্তক অবনত করতে।

অবশেষে আপনাকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জানাই উষ্ণ মোবারকবাদ ও ট্রাকভর্তি রক্তিম গোলাপের শুভেচ্ছা। আপনি ঘুমিয়ে পড়া জাতিকে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে কারারুদ্ধ মা, বোনদেরকে বেঈমানদের কবল থেকে রক্ষা করতে অবিরাম উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণীত করে চলেছেন। আল্লাহ আপনার সহায় হোন।

হাফেজ মুহাম্মদ আরিফুল হক বিন মুমিন
জামেয়া মাদানীয়া সিলোনীয়া ফেনী, বাংলাদেশ

যুগে যুগে আল্লাহ পাক এ ধরার বুকে এমন এমন মহা মনীষীদের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন যাদের ত্যাগ, সাধনা ও সংগ্রামী তৎপরতায় দ্বীনি ঝান্ডা উড্ডীন রয়েছে। তাদের মধ্যে এ যুগের একজন অন্যতম মনীষী হলেন মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম। তার লেখার উপস্থাপনা ভঙ্গি সকল লেখকের লেখাকে হার মানায়। তার লিখনী দ্বারা সত্যই আজ সকল বই প্রেমিকরা অভিভূত। বিশেষ করে তার লেখা হৃদয় গলে সিরিজের প্রত্যেকটি বইয়ের প্রতিটি শিরোনামের প্রতিটি গল্পই মনোমুগ্ধকর ও আবেগাপ্লুত শাণিত বাণী। আর সেই শাণিত বাণীর অব্যর্থ আঘাতে আমার হৃদয় ও মন আজ পুলকিত। গৃহস্থলী ও সন্তানাদি লালন পালনের হাজারো ঝামেলার মাঝেও সিরিজগুলোর প্রতিটি গল্পের ধারাবাহিকতার কাছে আমার সময়ের বিশেষ অংশই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

আমার দেখাদেখি আশপাশের অনেক মহিলাও হৃদয় গলে সিরিজের প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। এ যেন এক লেখনী যাদু। আমি লেখককে সিরিজের ধারা অব্যাহত

রাখার অনুরোধ করে তার দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং পরবর্তী কিছু সিরিজের নাম সুপারিশ করছি। যথা- (১) যে গল্পে হৃদয় কাঁপে (২) হৃদয় বিদীর্ণ গল্প/কাহিনী (৩) মর্মস্পর্শী আশ্চর্য কাহিনী (৪) মন মাতানো ঘটনাবলি (৫) মনোমুগ্ধকর সত্য কাহিনী (৬) বিগত দিনের কুড়ানো কাহিনী।

হুসনা আরা আহসান (মুসলিমা)
হাফেজ মাওলানা আহসানুল্লাহ
পোনা মাদরাসা রোড, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ-৮১৩০

বর্তমান বিশ্ব যখন অপসংস্কৃতির অমানিশায় ভরপুর, বেহায়াপনা আর অশ্লীলতায় সমাজ যখন কলঙ্কিত, ঠিক তখনি অন্ধকারের কালো পর্দা মাড়িয়ে শুক্লাদশী জোছনা ঝরা দিলকাশ চাঁদ উর্দ্ধ গগণে উদিত হওয়ার ন্যায় প্রকাশ পেল হৃদয় গলে সিরিজ, যার আলোতে পথের দিশা পেয়েছে হাজারো পথিক! যার উজ্জ্বলতায় বিমোহিত হয়েছে লাখো অন্তর, যার জোৎনায় আলোকিত হয়েছে কোটি মন।

হৃদয় গলে সিরিজ!! তুমি এমন এক আলো যা নৈরাশ্যের দিগন্তে আশার রবি উদিত হওয়ার ন্যায়, তুমি এমন এক ভরসা, যা কুলহীন পারাবারে কাষ্ঠ নির্মিত তরণীর ন্যায়, তুমি এমন এক প্রশান্তি যা ধুসর মরুভূমিতে বারি বর্ষণের ন্যায়, তুমি এমন এক তৃপ্তি, যা হৃদয় মরুতে সবুজ শ্যামলে বিমোহিতের ন্যায়।

হৃদয় গলে সিরিজ!! তোমার অস্তিত্ব সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ! তোমার উপস্থিতি মানব সভ্যতার মুক্তি!! তোমার ক্ষুরধার কলম অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটন।

হৃদয় গলে সিরিজ!!! তোমার অগ্রণী ভূমিকায় নাস্তিকদের সকল ষড়যন্ত্র তৃণের ন্যায় ভেসে যাক, ছিন্ন হোক তাদের সকল জাল আর ভেস্তে যাক তাদের সকল অপকৌশল।

হৃদয় গলে সিরিজ!!! তোমার নিকট আমার ঐকান্তিক কামনা, তুমি তোমার শুভ যাত্রাকে আরো দীর্ঘায়িত করে তোমার পরশে আমার ন্যায় হাজারো হৃদয়কে প্রশান্ত করে দাও। তোমার নৈসর্গিক রূপে সকলকে বিমুগ্ধ করে দাও এবং তোমার রূপালী আভায় সবাইকে করে দাও আলোক উজ্জ্বল।

মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ (চৈতন্যা)
জামাতে শরহে বেকায়া
দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদরাসা
নরসিংদী-১৬০০

মুহতারাম লেখক, আমি আপনার লেখা সিরিজগুলো যখন প্রথম দেখলাম, তখন মনে করলাম এগুলো বাজে বই। তারপর আমি চার দিকে মানুষের মুখে শুনতে থাকি বইগুলির কথা এবং তার গুণাবলির কথা। এক পর্যায়ে এও শুনলাম যে, ইহা দ্বারা সমাজের মানুষ অনেক উপকৃত হচ্ছে এবং পথ ভুলা যুবক যুবতীরা আলোর পথ পাচ্ছে। তখন আমি মনকে পরিবর্তন করার ইচ্ছা করলাম বইগুলির দিকে এবং খুলে কিছু দূর পড়তেই আমার ধারণা পাল্টে গেল। তখন থেকে আমি নিজে পড়তে থাকি এবং আমার বন্ধুদের সংগ্রহ করে দিতে থাকি।

দুআ করি আল্লাহ যেন আপনার হায়াতকে বৃদ্ধি করে দেন এবং এ ধরনের আরো বই লেখার তাওফীক দান করেন। আমীন।

মুহাম্মদ শাহিদুর রহমান (শাহিদ)
গ্রাম ঃ দোহাকুলা, বাঘারপাড়া, যশোর।

প্রিয় লেখক, লিখার শুরুতেই আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক সালাম ও মোবারকবাদ। জনাব! দেশে নানা রকম সমস্যা সৃষ্টির একটি অন্যতম কারণ হল নৈতিক অবক্ষয়। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অশ্লীলতা, নগ্নতা, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণসহ অন্যান্য অপকর্ম বন্ধ হয়ে যেতো, যদি দেশের মানুষ উন্নত নৈতিকতার অধিকারী হতো। এসব সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করে উপযুক্ত প্রতিকার ব্যবস্থা না নিয়ে যতো রকম চেষ্টাই করা হোক না কেন, ফলাফল নেতিবাচকই থাকবে। আজ মুসলমানরা চরম সংকটময় পরিস্থিতির স্বীকার। বর্তমান সময়ে মুসলিম জাতির আত্মাকে সজিব ও স্বচ্ছ করে গড়ে তোলার জন্য আপনার রচিত বইগুলি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আর আমাকে তো হৃদয় গলে সিরিজ পাগল করে ফেলেছে। আমি ১ম থেকে ১১তম সিরিজ পর্যন্ত পড়েছি। আমি আশা করব আপনি আমাদেরকে এ ধরনের আরও অনেক বই উপহার দিয়ে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটন করে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও সুন্দর জীবনের পথ দেখাবেন। আর পাঠক মহলের কাছে আমার আবেদন- হৃদয় গলে সিরিজ নিজে পড়ুন অন্যদের উপহার দিন। পরিশেষে জনাব লেখক ও পাঠকদের নেক হায়াত কামনা করে সমাপ্ত করলাম।

হাফেজ তাফাজ্জুল হক
শিক্ষক, গোপীনাথপুর দারুল উলূম ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা
কসবা, বি.বাড়ীয়া, ফোন ঃ ০১৮৮৬৮৯৬১৩

মুহতারাম ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আমি একজন কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী। আমার বই পড়ার এত নেশা না হলেও সামনে কখনো ভাল বই পেলে তা পড়ার লোভ সামলাতে পারি না। আর যদি না পড়তে পারি তাহলে খুব আফসোস লাগে। প্রথমে যখন আপনার ১ম খন্ডটি পড়ি তখন এতই ভাল লাগে যে, মাত্র দুই ঘন্টার মধ্যে উহা শেষ করে ফেলি। এর প্রতিটি ঘটনা আমার মধ্যে শিহরণ জাগায়। এমনকি নিজের অজান্তে চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে। এরপরে আপনার সিরিজের সবগুলো বই পড়ে নেই। এগুলোও আমার নিকট খুব ভাল লেগেছে এবং এ থেকে অনেক উপদেশ পেয়েছি। অন্যান্য পাঠকদের মত আমারও অভিমত হল, এই সিরিজ বন্ধ না হয়ে সম্মুখে চলতে থাকুক। যেন বিশ্ববাসী তা পড়ে হেদায়েতের পথ পায়। ইতোমধ্যে এই যুগপোযোগী দ্বীনী কিতাবের ছোঁয়ায় অনেকেই আলোর সন্ধান পেয়েছে। ভবিষ্যতেও পাবে ইনশাআল্লাহ। যে গল্পে হৃদয় গলে শুধু আমার নয় প্রতিটি পাঠক পাঠিকাদের হৃদয়কে করেছে আলোকিত। দুআ করি, আল্লাহ যেন আমাদের কলম সৈনিক ভাইকে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করেন এবং তার মত আরো নতুন কলম সৈনিক সৃষ্টি করেন।

হে হৃদয় গলে সিরিজ!

তুমি সত্যিই সকলের হৃদয় গলাও,
তুমি সত্যিই অতুলনীয় মহান
তুমি সত্যিই হকের দিশারী।
তুমি পথভ্রষ্টকে দাও পথের দিশা।
যুগ যুগ ধরে শুনিয়ে যাও হিদায়েতের বাণী
তুমি ছড়িয়ে পড় গোটা বিশ্ব জুড়ে
তুমি বেঁচে থাক অনাদি কাল পর্যন্ত।

মুহতারাম ভাই! আপনি পরবর্তী সিরিজের জন্য কিছু নাম চেয়েছিলেন। এখানে কয়েকটি নাম দেওয়া হল (১) যে গল্পে আত্মায় প্রশান্তি আসে। (২) যে গল্পে তাকওয়া অর্জন হয়। (৩) যে গল্পে ঈমান দৃঢ় হয়।

সালমা ফারিহা
প্রযত্নে ঃ রফিকুল ইসলাম (ইঞ্জিনিয়ার)
মধ্য মেড্ডা (বনলতা), বাসা নং ১০১৬, বি.বাড়ীয়া।

প্রিয় লেখক, এ পর্যন্ত আমি প্রথম খন্ড থেকে সিরিজ ১০ পর্যন্ত বইগুলো পড়েছি। তম্মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছে- প্রথম খন্ডের 'পর্দাহীন মেয়েদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে কি?' দ্বিতীয় খন্ডের অবৈধ প্রেমের নিষ্ঠুর পরিণতি, তৃতীয় খন্ডের পর্দাহীনতার নগদ শাস্তি, সিরিজ-৪ এর দাড়ি রাখার নগদ পুরস্কার, সিরিজ-৫ এর বুদ্ধিমতী নারীর প্রজ্ঞাপূর্ণ জিজ্ঞাসা, সিরিজ-৬ এর ফুল শয্যায় কিছুক্ষণ, সিরিজ-৭ এর এমন সন্তানের পিতা যেন কেউ না হয়, সিরিজ-৮ এর এতিমের প্রতি ভালবাসা, সিরিজ-৯ এর সতিত্ব রক্ষার শুভ পরিণাম, সিরিজ-১০ এর হৃদয়ের আর্তনাদ। আমি এস এস সি পরীক্ষা দিয়েছি। আগে বোরকা পড়তাম না। এখন পড়ি। আপনার বই পাঠ করে এখন ঈমানদার হয়ে জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি আপনার বইগুলো আমার এক আত্মীয়কে পড়তে দিয়েছিলাম। তিনি আমাকে আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী চলবেন বলে কথা দিয়েছেন। এজন্য আমি অনেককে আপনার বইগুলো সংগ্রহ করে পাঠ করার জন্য বলেছি। আল্লাহ পাক আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন। আমীন।

মাহফুজা ইসলাম পপি
পিতা ঃ ফখরুল ইসলাম ফিরোজ (উকিল)
গ্রাম ঃ বড় কৈবর্ত্তখালী, কৈবর্ত্তখালী, রাজাপুর, ঝালকাঠি।

শ্রদ্ধেয় বড় ভাই! আমি একজন মাদরাসার ছাত্র। মাদরাসার পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন বই পড়া পছন্দ করতাম না। হঠাৎ করে আমি আমার এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করি। তখন দেখি তার হাতে একটি বই। নাম হল যে গল্পে হৃদয় জুড়ে। আমি তার হাত থেকে বইটি নিয়ে একটি ঘটনা পড়লাম। ঘটনাটির নাম সতিত্ব রক্ষার শুভ পরিণাম। এ ঘটনটি

পড়ার পর আমার চোখ দিয়ে অশ্রু বের হয়ে আসল। আমি বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম- বইটি কোথায় থেকে সংগ্রহ করেছ? বন্ধু বলল, নরসিংদী লাইব্রেরী থেকে। তখন আমি বললাম, এই বইটি কত খন্ড পর্যন্ত আছে? সে বলল, দশ খন্ড পর্যন্ত। তারপর আমি ১ম খন্ড থেকে ১০ খন্ড পর্যন্ত সংগ্রহ করি এবং আমার মা বোনদেরকে পড়তে দেই। তারা তা পড়ে খুব আনন্দিত হয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ জাতীয় যত বই বের হয় সবগুলো কিনে আনিও। দোয়া করি, আল্লাহ তা'আলা যেন আপনাকে এ জাতীয় আরো শত শত বই বের করার তাওফীক দেন। আমাদের বিশ্বাস, আপনার বইগুলো মুসলমানদের অন্তর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আপনার নিকট অনুরোধ করছি ১০ খন্ডের উপরই ক্ষান্ত হবেন না। বরং আরো শত শত বই বের করার চেষ্টা করবেন।

আবুল কালাম আযাদ

জামাতে নাহুমীর, দারুল উলূম আশরাফিয়া মাদরাসা
পাহাড় উজিলাব, বেলাব, নরসিংদী।

প্রথমে আমার সালাম নিবেন, পরকথা হল, আপনার লিখা হৃদয় গলে সিরিজের ৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খন্ড পড়ে যার পর নাই আনন্দিত হয়েছি। আমি এ বইগুলো অন্যকেও পড়তে দিয়েছি। সবাই বই পড়ে বলেছে এর অপর খন্ডগুলো দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমাদের বিয়ানী বাজার পাঠাগারে আপনার হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো আসে নি। তবে বাকি খন্ডগুলো পাওয়ার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি। খোদার দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনাকে সুস্থ শরীরে দীর্ঘদিন রাখেন এবং সিরিজকে কমপক্ষে ১০০ পর্যন্ত পৌঁছানোর তৌফীক দান করেন।

মোহাম্মদ আব্দুস ছুবহান

গ্রাম ঃ কাছাটুল, বিয়ানীবাজার, জিলা ঃ সিলেট

পরবর্তী বই

সোনালী সংসার

(ইসলামী ভাবধারায় লিখিত চরিত্রগঠনমূলক
একটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় উপন্যাস)

সাড়া জা
সত্য ক